শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

Social thinking in Shawqi and Rabindranath's poem: A comparative analysis

(এম ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মো. আবদুল কাদির
চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

গবেষক

মো. নুরুল আমিন
রেজিস্টেশন নং: ১৫১/২০১৫-২০১৬ খ্রি.
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর ২০২০ খ্রি.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

Social thinking in Shawqi and Rabindranath's poem: A comparative analysis

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আহমাদ শাওকী

(১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.)

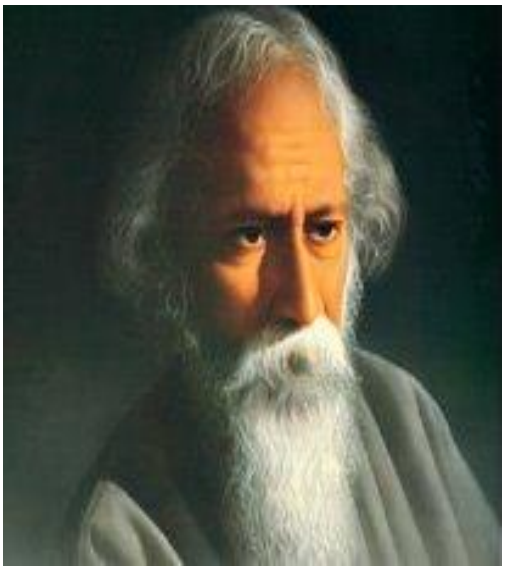

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম ফিল ডিগ্রির জন্য এই অভিসন্দর্ভ অথবা এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

নিবেদক

(মো. নুরুল আমিন)
এম ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
রেজিস্টেশন: ১৫১/২০১৫-২০১৬ খ্রি.
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম ফিল গবেষক মো. নুরুল আমিন কর্তৃক এম ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রনয়ণ করা হয়েছে। এটি তার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে উক্ত শিরোনামে ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম ফিল ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি। আমি গবেষকের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. মো. আবদুল কাদির)
তত্ত্বাবধায়ক ও চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর রহমত ও করুণায় **শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তাঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পাদন করতে পেরেছি। রাসূলুল কারীম হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানুষের কর্মের মূল্যায়নের অন্যতম মাধ্যম। এ ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণযোগ্য। তবুও যে কথা না বললেই নয়, যার উৎসাহ উদ্দীপনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীল পরামর্শ আমার গবেষণাকর্মকে প্রকৃত গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. আবদুল কাদির স্যার। আমি সশ্রদ্ধচিত্রে তাঁর এ অকৃত্রিম আন্তরিকতাকে স্বীকার করছি। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহসহ সব বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অভিসন্দর্ভটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভুলত্রুটি সংশোধন করে গবেষণাকর্মটি সমৃদ্ধ ও সৃষ্টিশীল করার পথ সুগম করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আল্লাহ তায়ালা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারের প্রতি যিনি এ গবেষণা শুরু করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এ বিষয় সর্বদা খোঁজ খবর রাখতেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বিভাগ সংশ্লিষ্ট সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি যাঁদের কাছ থেকে এ গবেষণাকর্মের বিষয় সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার বাবা আলহাজ্ব আলী আহমাদ ও মা ফায়রুন নেসা এবং শ্বশুর আলহাজ্ব মাওলানা আমিন উল্ল্যাহ ও শাশুড়ি ফৌজিয়া বেগমের প্রতি যাঁদের দোয়া আমাদের জীবনের পাথেয়। আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে আমার ভাই-বোনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যারা সর্বদা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে শেষ করার জন্য আমাকে সবসময় উজ্জীবিত রাখতেন আমার ভাই জনাব মাহমুদুল হাসান ইমরোজ। তাঁর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ডা.

Dhaka University Institutional Repository

কাজী মো. নূর-উল ফেরদৌস, আলহাজ্ব মিজানুর রহমান ভূঁইয়া ও জনাব কাজী ফজলুল করিম এঁর প্রতি যাদের দোয়া ও উৎসাহে এ গবেষণাকর্মটি সফলভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। সাথে সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সহকর্মী জনাব মো. জাবেদ হোসাইনের প্রতি যিনি এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে আমাকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বইপত্র দিয়ে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি ও বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি যাঁরা বিভিন্ন সেবা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। অত্যন্ত ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে যিনি অভিসন্দর্ভটি রচনা শেষ করতে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে এবং উৎসাহ যুগিয়েছে তিনি হলেন আমার সহধর্মিনী মাকসুদা আক্তার, তাঁর প্রতিও আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। আল্লাহ তায়ালা সকলকে কাল কেয়ামতের মাঠে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

অক্টোবর ২০২০ খ্রি.

নিবেদক
মো. নুরুল আমিন
এম ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

শব্দ সংকেত	শব্দের পূর্ণরূপ
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
ড.	ডক্টর
পৃ.	পৃষ্ঠা
সা.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	রাদিআল্লাহু আনহু
ص.	صفحة
ج.	جلد/جزء
م.	الميلاد

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিবরণ		পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা		**১২**
প্রথম অধ্যায় **শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী**		**১৬**
১ম পরিচ্ছেদ	জন্ম ও বংশ পরিচয় এবং প্রাথমিক জীবন	১৮
২য় পরিচ্ছেদ	শিক্ষা জীবন	২০
৩য় পরিচ্ছেদ	বৈবাহিক ও কর্মজীবন	২২
৪র্থ পরিচ্ছেদ	উপাধি লাভ ও অর্জন এবং শেষ জীবন	২৫
দ্বিতীয় অধ্যায় **কবিতায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের অবদান**		**২৮**
১ম পরিচ্ছেদ	শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্যগ্রন্থাবলী	৩১
২য় পরিচ্ছেদ	শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল উপজীব্য/ বিষয়বস্তু	৩৮
৩য় পরিচ্ছেদ	শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	৪৭
তৃতীয় অধ্যায় **শাওকী ও রবীন্দ্রনাথকে সামাজিক কবি হিসেবে মূল্যায়ন**		**৪৯**
১ম পরিচ্ছেদ	সমাজের সাধারণ মানুষদের কবি হিসেবে মূল্যায়ন	৫১
২য় পরিচ্ছেদ	সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ	৫৬
৩য় পরিচ্ছেদ	শিক্ষা ও ধর্মীয় চিন্তায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ	৫৯
৪র্থ পরিচ্ছেদ	নারী ভাবনায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ	৬৫

Dhaka University Institutional Repository

চর্তুথ অধ্যায় **শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সামাজিক দিকসমূহ**		**৭০**
১ম পরিচ্ছেদ	নারী অধিকার নিশ্চিতকরণে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা	৭৩
২য় পরিচ্ছেদ	সমাজ সংস্কারে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ	৯৫
৩য় পরিচ্ছেদ	দেশের উন্নয়নে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা	১২৩
পঞ্চম অধ্যায় **শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা**		**১৪৪**
১ম পরিচ্ছেদ	বাস্তব সমাজ চিত্রের বর্ণনা	১৪৬
২য় পরিচ্ছেদ	সমাজ প্রকৃতির বর্ণনায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ	১৫৩
৩য় পরিচ্ছেদ	সমাজ প্রাসঙ্গিক ভাবনায় ধর্মীয় চিন্তা	১৬১
উপসংহার		১৭৭
গ্রন্থপঞ্জী		১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে আরবি ও বাংলা সাহিত্যের অবস্থান সুদৃঢ়। সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো কবিতা। আর সাহিত্যের এ শাখাকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন আধুনিক আরবি সাহিত্যের কবি কুলের সম্রাট হিসেবে পরিচিত আহমাদ শাওকী এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশ্বকবি হিসেবে খ্যাত এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী (১৯১৩ খ্রি.) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ দু'জন বিস্ময়কর ও প্রতিভাবান কবি নিজ নিজ ভাষায় কবিতা রচনা করে কাব্য ও সাহিত্যের অগ্রগতি ও বিকাশে ব্যাপক অবদান রাখেন। আহমাদ শাওকী আরবি কবিতার পুনর্জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি আরবি কবিতাকে আধুনিক বিশ্বের উন্নত কাব্যাঙ্গন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বাঙ্গনে পরিচিত করেছেন। শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ উভয় সামাজিক কবি হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। সমাজ নিয়ে তাদের উভয়ের চিন্তায় অভিন্ন মিল পরিলক্ষিত হয়। তারা নিজ নিজ সমাজের বাস্তবমুখী বিভিন্ন চিত্র কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। চলমান সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যার সমাধান নিয়ে তারা রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা। সমাজ অগ্রগতি, উন্নয়ন ও সংস্কারে তাদের কবিতা অনবদ্য অবদান রাখে। এজন্য অদ্যবদি তাদের কবিতা সর্বজনে সমৃদ্ধ। শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ তাদের কবিতার মাধ্যমে সকলকে সমাজ সচেতন করার চেষ্টা করেন। তারা উভয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাদের কবিতার উপজীব্য হিসেবে আনয়ন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে মিসরীয় সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার ও অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শাসকদের নির্যাতনে মিশরবাসীগণ ছিল নিষ্পেষিত। এসব থেকে মিসরবাসীদের মুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসেন আহমাদ শাওকী। তিনি লিখনী অস্ত্র দিয়ে মিশরে সফল সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক কবিতায় মিশরের মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে। তারা ন্যায্য অধিকার আদায়ে সংগ্রামী হয়ে ওঠে। সুতরাং স্পষ্ট বলা যায় যে, একটি ঘুমন্ত সমাজের মানুষদের সজাগ ও সচেতন করতে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে পুনর্গঠনে শাওকীর কবিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়াও শাওকীর কবিতায় সামাজিক

বিষয়াবলীর মধ্যে শিক্ষা, নারী ও শ্রম ইত্যাদি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। শাওকী সামাজিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন মদ পান নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। নারীর স্বাধীনতা, অধিকার ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কবিতা লিখে নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সজাগ করেছেন। তিনি নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে পর্দায় রাখার আহবান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর দাদী, মা ও বাবার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোঁকগাথা রচনার মাধ্যমে নিজেকে একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া খেদীভ তাওফীকের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদানে প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছেন। আধুনিক সমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, রেডক্রস, রেডক্রিসেন্ট ইত্যাদির উপকারিতা তুলে ধরেছেন। রাসূল (স.) এর অনুসরণে এবং তাঁর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাসূল (স.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করে ধর্মীয় অনুশাসনে অধিকতর যত্নবান হয়েছেন। ইসলামের আবির্ভাব থেকে মিশরের ফাতিমীয় রাষ্ট্রের পতন পর্যন্ত মুসলমানদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন, বনু উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ফাতিমীয় খলিফাদের জীবনী আলোচনা করেন এবং সকলকে তাদের মতো উন্নত চরিত্র গঠনে উৎসাহ যুগিয়েছেন। মিসরের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সকলকে পরিশ্রমী ও আন্তরিকভাবে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। মিশরীয়দের মাঝে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে কবিতা রচনা করেছেন। এসব কারণে আহমাদ শাওকীকে একজন সামাজিক কবি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের আরেক সামাজিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কবিতার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এ দেশের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করেন। সমাজ সচেতনতামূলক ব্যাপক কবিতা রচনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ খ্রি. দিল্লী দরবারে এক অধিবেশনে রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সম্রাজ্ঞী ঘোষণার প্রস্তাবকে ধিক্কার দিয়ে এক দীর্ঘ কবিতা পাঠ করে তাঁর দেশাত্মবোধের পরিচয় দেন। দুর্ভিক্ষে পীড়িত দিল্লিতে বড় লাটদের বিলাসবহুল জীবন যাপনের প্রতিও এ কবিতায় তীব্র প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়। কবিতার মাধ্যমে তিনি সকল সামাজিক অন্যায় অপরাধকে ধিক্কার জানান। এ দেশের মানুষদের সামাজিক ও

রাজনৈতিক সচেতন করার চেষ্টা করেন। ১৮৭৮ খ্রি. রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে থাকাকালীন বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতা ও শিক্ষা বিষয়ক কবিতা রচনা করেছেন। ১৮৫১-১৯২৮ খ্রি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুধর্মের অপপ্রচার রোধে প্রতিবাদী লেখালেখি করে এ অঞ্চলের মানুষদের ধর্মীয় অনুভূতিকে সজাগ ও সচেতন করেছেন। ফলে ধর্মীয় অপপ্রচার রোধ করে এ অঞ্চলের মানুষগণ স্ব স্ব ধর্ম সঠিকভাবে পালনে উদ্বুদ্ধ হন। গ্রামীন সমাজের বিচিত্র জীবনচিত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটে উঠেছে। তিনি ভালোবাসাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে মানবপ্রেম ও প্রকৃতি প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমাজ জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনা ও সুখ-দুঃখের বার্তা কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে সমাজ-বাস্তবতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি সমাজকে তিনি কবিতার মাধ্যমে একটি আলোকিত সমাজে পরিনত করার চেষ্টা করেছেন। বাঙালি সমাজ জীবনের মিথ্যা, অহংকার, পরনিন্দা, পরচর্চা, লোভ ইত্যাদি নানা সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণে ভর্ৎসনা ও নিন্দা জানিয়েছেন তাঁর শৈল্পিক উপস্থাপনায়।

এসব গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে সামাজিক কবিতায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। অত্র অভিসন্দর্ভে উভয়ের সমাজচিন্তা ও ভাবনা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

অত্র অভিসন্দর্ভটি একটি ভূমিকা ও উপসংহার এবং পাঁচটি অধ্যায়ে রচিত। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী'। এখানে আহমাদ শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ ভাষায় কাব্য চর্চার মাধ্যমে যে সকল অবদান রাখেন তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথকে সামাজিক কবি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। শাওকী ও রবীন্দ্রনাথকে সামাজিক কবি হিসেবে মূল্যায়ন, সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকা, এছাড়াও সমাজের শিক্ষা উন্নয়ন ও ধর্মীয় চেতনা জাগ্রতকরণে তাদের অবদানের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চর্তুথ অধ্যায়ে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সামাজিক

চিন্তাচেতনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি আলোচ্য গবেষণাকর্মের মূল অংশ বলা যেতে পারে। এ অধ্যায়ে সামাজিকভাবে নারীর অধিকার ও নারীর মর্যাদা নিশ্চিতকরণে সমাজের অপ-সংস্কৃতির চর্চা বিশেষ করে যৌতুক, মাদক ও বাল্যবিবাহ বিষয়ক তাদের বিভিন্ন কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়টি রচিত হয়েছে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা নিয়ে। এটি এ গবেষণাকর্মের শেষ অধ্যায়। সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুঃখ- দুর্দশা, সুখ-সমৃদ্ধি; প্রকৃতির সাথে সমাজের নিবিড় বন্ধন; প্রকৃতির প্রভাবে সমাজের মানুষদের স্বভাব-চরিত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ইত্যাদির বৈচিত্রময় চিত্র সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জির মাধ্যমে গবেষণাকর্মের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

আশা করছি এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে আরবি ও বাংলা ভাষাভাষী লেখক, পাঠক ও গবেষকসহ সকলেই উপকৃত হবেন। যারা সমাজকে নিয়ে ভাবেন, সমাজের সকল অসংগতি দূর করতে চান, এ গবেষণাকর্মটি তাদের জন্য অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

প্রথম অধ্যায়

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে দুইজন খ্যাতনামা কবি দুই ভাষার সাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল তাদের একজন আরবি সাহিত্যের আধুনিক যুগের বিশ্বমানের মিসরীয় কবি ও মিসরীয় কবিকুল শিরমনি আহমাদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.)। তিনি আরবি কবিতার নবজাগরণের অন্যতম স্থপতি। অন্যজন বাংলা সাহিত্যাঙ্গনের কিংবদন্তি, বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃত ও নোবেল (১৯১৩ খ্রি.) বিজয়ী বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.)। তাঁরা স্ব স্ব জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়নে কাব্যিক ছন্দে কাজ করেছেন। বিশেষ করে সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাদের উভয়ের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁরা সমাজের অতি গভীরে প্রবেশ করে সমাজের সকল অসংগতি বের করে তা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। সমাজের মানুষদের কল্যাণের পথ দেখিয়ে রচনা করেছেন অনেক সচেতনতামূলক কবিতা। তাঁরা একদিকে ছিলেন বিশ্বমানের কবি ও সাহিত্যিক অন্যদিকে জননন্দিত সমাজসংস্কারক। তাঁরা সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষদের নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন এবং তাদের ভেতরের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা কবিতার ছন্দে উপস্থাপন করতেন। এভাবে তাঁরা সমাজসংস্কার ও উন্নয়ন বিষয়ক অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। তাদের উভয়ের কবিতায় একটি অভিন্ন মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলো, একটি দেশ ও জাতির উন্নয়ন করতে হলে সবার আগে সমাজে বসবাসরত প্রতিটি মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগতির কথা চিন্তা করা। এ কাজটি উভয় কবি সমান তালে করেছেন। এভাবে তাঁরা কবিতার মাধ্যমে সমাজে একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। যে আন্দোলনের মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষদের অধিকার আদায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সমাজের মানুষদের করেছেন সজাগ ও সচেতন। এ দুই ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের জীবন পরিক্রমা ছিল বর্ণাঢ্য ও মনমুগ্ধকর।

১ম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বংশ পরিচয় এবং প্রাথমিক জীবন

ক) মিসরে খেদীভ ইসমাঈলের শাসনামলে ১২৮৫ হিজরি মোতাবেক ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে মিশরের রাজধানী কায়রোতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আহমাদ শাওকী জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম আলী ইবনু আহম্মদ শাওকী। আহমাদ শাওকীর পিতামহ জারকিস নাম্নী কুর্দিস্থানের অধিবাসী ছিলেন। মুহাম্মদ আলী পাশার সময় তিনি মিসরে আগমন করেন। তৎকালীন মিসরের শাসনকর্তার অধীনে পরিষদ সদস্য ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। সাঈদ পাশার সময়কালে তিনি মিসরের রাজস্ব বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২] শাওকীর পিতামহ শারকাসী বা ককেশিয়ান [৩] এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এ ঘরেই আহমাদ শাওকীর পিতা আলী ইবনু আহমাদ শাওকী জন্মগ্রহণ করেন। শাওকীর নানা আহম্মদ হালীম ছিলেন তুরস্কের অধিবাসী। মিসরে ইব্রাহিম পাশার সময়কালে তিনি মিসরে আসেন এবং তামজার নান্নী নামক এক গ্রিক মহিলাকে বিবাহ করেন। এ ঘরে শাওকীর মাতা জন্মগ্রহণ করেন। তাই আহমাদ শাওকীর শরীরে কুর্দি বাবা, তুর্কি মাতা, শারকাসী দাদী এবং গ্রিক নানীর রক্ত প্রবাহিত। [৪] শাওকীর পিতা পেশায় একজন চাকুরিজীবী ছিলেন। শাওকীর বাবা অতি ব্যস্ততার কারণে ছেলের দেখাশুনা সেভাবে করতে পারেননি। মাত্র তিন বছর বয়সে আহমাদ শাওকীর মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর নানী শিশু শাওকীকে লালন পালন করেন। শাওকীর নানী ছিলেন ইসমাইল পাশার শাহী দরবারের পরিচারিকা। [৫] তাই আহমাদ শাওকী রাজদরবারে আনন্দঘন ও রাজকীয় পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন।

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার এক ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৭ মে ১৮৬১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের দাদার নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মগুরু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) [৬] এবং মাতা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী (১৮২৬-১৮৭৫)। [৭] ১৮৭৫ সালে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাকে হারান।

১। হান্না আল ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরবী (লেবানন: আল মাক্তাবাতুল বুলসিয়া, ১৯৮৭ খ্রি.) পৃ. ৯৭৩
২। আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরবী (মিসর: দারুল মা'আরিফা, ২০০০ খ্রি.) পৃ. ৫০০
৩। তুরস্ক, সিরিয়া ও জর্দানের জনগোষ্ঠী
৪। হান্না আল ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরবী, পৃ. ৯৭৩
৫। আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরবী, পৃ. ৫০০
৬। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০২ খ্রি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯
৭। প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) ১ম খণ্ড, পৃ. ২১ ও ২৫

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান। সেসময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল ব্রাহ্ম আদিধর্ম মতবাদের ধারক ও বাহক। [৮] এছাড়াও এ ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক, প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান সংগঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি.)। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ওপর ব্রাহ্মধর্মের প্রধান প্রচারকের দায়িত্ব অর্পিত হয়। [৯] পিতা দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম প্রচারে অধিকাংশ সময় কলকাতার বাইরে কাটাতেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের মা অসুস্থ থাকায় তিনি মায়ের সান্নিধ্য কিংবা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কাটে ভৃত্যদের নিকট। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে ঠাকুর বাড়িতে সেসময় আত্মসংযমের নিয়ম অনুসরণ করা হতো। [১০] তবে এটি সুস্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পরিপূর্ণ সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠেন।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৯। শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেনসহ প্রমূখ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ২৭২

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (কলকাতা: অশোক বুক এজেন্সী, ২০০২), পৃ. ৮, ১১, ১২০

২য় পরিচ্ছেদ
শিক্ষা জীবন

ক) আহমাদ শাওকীর প্রাথমিক শিক্ষা পারিবারিক পরিমণ্ডলে শুরু হয়। আহমাদ শাওকী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র চার বছর বয়সে শাওকীকে তাঁর মাতামহী কায়রোর হানাফী মহল্লায় অবস্থিত 'আশ শায়খ সালেহ্' নামক মাদরাসাতুল মুব্তাদিয়ায় বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ালেখা সমাপ্ত করে 'আল মাদ্রাসাতুল তাজ্হীযিয়্যা' নামক এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। [১১] ১৮৮৫ খ্রি. ১৫ বছর বয়সে সেখানে থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর তাঁর পিতা তাকে আইন মহাবিদ্যালয়ে আইনবিষয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। একই মহাবিদ্যালয়ের অনুবাদ বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৮৮৭ খ্রি. অনুবাদ বিষয় ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে ১৮৮৭ খ্রি. খেদীভ তাওফীক পাশার সহযোগিতায় ফ্রান্স গমন করেন। সেখানে দুই বছর অবস্থান করে আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখ্য, ফ্রান্সে থাকাকালে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের জন্য আলজিরিয়ায় চলে যান। সেখান থেকে পূর্ণ সুস্থ হয়ে তিনি আবার ফ্রান্সে ফিরে যান এবং অসমাপ্ত পড়াশোনা শেষ করে ১৮৯১ খ্রি. ইস্তাম্বুল হয়ে মিশরে ফিরে আসেন।[১২]

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হয় দাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ও ধরাবাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে যেয়ে পড়াশোনা করেননি। বাড়ীতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর গৃহ শিক্ষক ছিলেন।[১৩] কলকাতার নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও শেষে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। কিন্তু ওপনিবেশিক নিষ্প্রাণ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিতৃষ্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত বালক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তাই গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে বাড়ীতেই তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি লেখালেখির শুরু করেন। ১৮৭৩ খ্রি. মাত্র বারো বছর বয়সে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তাঁর

১১। হান্না আল ফাখুরি, তারীখুল আদাবিল আরবি, পৃ. ৯৭২
১২। ড. শাওকী দাঈফ, আল আদব আল আরবি আল মু'য়াসির ফি মিসর (কায়রো: দারুল মায়া'রিফ, ১৯৬১), পৃ. ১১০
১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্যভবন, ২০১৬), পৃ. ৬৬

প্রথম 'অভিলাষ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যান রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে তিনি ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালে 'ইউনিভার্সিটি কলেজ' লন্ডনে আইনবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু সাহিত্যচর্চার আকর্ষণে পড়াশোনা সমাপ্ত করতে পারেননি। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন শেক্স্পিয়র ও অন্যান্য ইংরেজ সাহিত্যিকের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন রিলিজিও মেদিচি, কোরিওলেনাস ও অ্যান্টিনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা। এ সময় তিনি ইংল্যান্ডের বসবাসের অভিজ্ঞতার কথা "ভারতী" পত্রিকায় পত্রাকারে পাঠাতেন। উক্ত পত্রিকায় এই লেখাগুলি জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনাসহ প্রকাশিত হতো য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্রধারা নামে। ১৮৮১ সালে সেই পত্রাবলি য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র নামে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ। অবশেষে ১৮৮০ সালে প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে কোনো ডিগ্রি না নিয়ে এবং ব্যারিস্টারি পড়া শুরু না করেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। [১৪]

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৬, ৬৬, ৯০

৩য় পরিচ্ছেদ

বৈবাহিক ও কর্মজীবন

১) বৈবাহিক জীবন: ক) আহমাদ শাওকী মিসরের এক ধনী পরিবারে বিবাহ করেন। শ্বশুর বাড়ী থেকে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হন। প্রাচুর্যের মাঝে বেশ সুখকর ও আনন্দময় পরিবেশে তিনি পারিবারিক জীবন কাটান। তাদের আমীনা নামে একটি কন্যা সন্তান এবং আলী ও হোসাইন নামে দু'জন পুত্র সন্তান ছিল। [১৫]

খ) ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২ বছর ৭ মাস বয়সে বর্তমান খুলনা জেলার ফুলতলা নামক স্থানের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মামাবাড়ী দক্ষিণডিহি গ্রামে ঠাকুরবাড়ির জমিদারি এস্টেটের কর্মচারী বেনীমাধব রায় চৌধুরী ও দাক্ষায়নী দেবীর একমাত্র কন্যা ভবতারিণী দেবীকে বিয়ে করেন। ভবতারিণী দেবী পদ্ম, ফুলি বা ফেলী নামেও পরিচিত ছিলেন। বিয়ের পর ঠাকুর পরিবারের রেওয়াজ অনুযায়ী ভবতারিণী দেবীর নাম হয় মৃণালিনী দেবী (১৮৭৩- ১৯০২)।[১৬] তাদের পাঁচজন সন্তান ছিল: মাধুরীলতা (১৮৮৬-১৯১৮), রথীন্দ্রনাথ (১৮৮৮-১৯৬১), রেণুকা (১৮৯১-১৯০৩), মীরা (১৮৯৪-১৯৬৯) এবং শমীন্দ্রনাথ (১৮৯৬-১৯০৭)। এঁদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই রেণুকা ও শমীন্দ্রনাথ মৃত্যু বরণ করেন। [১৭]

২। কর্ম জীবন: ক) আহমাদ শাওকী তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন খেদীভ শাসক তাওফীক পাশার রাজদরবারে সভাকবি হিসেবে। ১৮৯১ খ্রি. তাওফীক পাশার মৃত্যুর পর খেদীভ শাসক হিসেবে সিংহাসনে বসেন খেদীভ দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী। আহমাদ শাওকী দ্বিতীয় আব্বাস হিলমীর প্রধান মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৪ খ্রি. তিনি খেদীভ আব্বাসের পক্ষ থেকে জেনেভায় প্রাচ্যবিদদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আন্তজার্তিক সম্মেলনে মিশরের প্রতিনিধিত্ব করেন।[১৮] এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানী সফর করেন। তুর্কীদের সাথে সম্পর্ক রাখায় ১৯১৫ খ্রি. ইংরেজ কর্তৃক খেদীভ দ্বিতীয় আব্বাস ক্ষমতাচ্যুত হন। তাঁর স্থলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন হোসাইন কামিল।

১৫। হান্না আল ফাখুরি, তারীখুল আদাবিল আরবি, পৃ. ৯৭৩

১৬। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ: কবি ও কাব্য (ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১৫), পৃ. ১৪

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন (১৮৬১-১৯৪১), উকিপিডিয়া

১৮। হান্না আল ফাখুরি, তারীখুল আদাবিল আরবি, পৃ. ৯৭৩

হোসাইন কামিল আহমাদ শাওকীকে খেদীভ আব্বাসের দরবারী কবি হওয়ায় স্পেনে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত (১৯১৫-১৯১৯ খ্রি.) তিনি স্পেনের বার্সিলোনায় নির্বাসিত ছিলেন। একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাঙ্গামা অন্যদিকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বঞ্চিত হয়ে বেশ কষ্টে দিনাতিপাত করেন। ১৯১৯ খ্রি. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর কবি তাঁর জন্মভূমি মিশরে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় নিজ বাড়ীতে অবস্থান করেন এবং নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। মাঝেমধ্যে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের তুরস্ক, লেবানন ও সিরিয়া সফর করেন। ফলে রাজদরবারের দরবারী কবির পরিবর্তে জনমানুষের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ হয়। আর সে কারণেই গণমানুষের বিভিন্ন জাতীয় ও সামাজিক সমস্যাবলী কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলতে সক্ষম হন। বিভিন্ন দেশ সফরের ফলে সিরিয়া ও লেবাননসহ অনেক আরব দেশে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।[১৯] ১৯২৬ সালে মিশরে ভারতীয় উপমহাদেশের সে সময়ের প্রখ্যাত কবি ও নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে আহমাদ শাওকীর সাক্ষাৎ হয়। কবি আহমাদ শাওকী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাসায় আমন্ত্রণ জানান। দু'জনের আলাপ-চারিতায় শাওকী বলেন: 'আপনি তো পাক-ভারত উপমহাদেশের ন্যায় বিশাল ভূ খণ্ডের কবি। কাজেই আপনার কবিতার পাঠক অগণিত।' রবীন্দ্রনাথ শাওকীর কথার প্রতি-উত্তরে বলেন: 'আমি বিশাল ভূখন্ডের কবি বটে কিন্তু এর প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ আলাদা-আলাদা ভাষায় কথা বলে। আর আপনি এক দেশের কবি হলেও গোটা মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে আপনার কবিতার অগণিত পাঠক। কাজেই আপনার কবিতার পাঠক সংখ্যার তুলনায় আমার কবিতার পাঠকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।' [২০]

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ২৮ বছর বয়সে পারিবারিক জমিদারি দেখাশুনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। জমিদারি পরিচালনার বিষয় ভরসা রেখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির মতো এ গুরুদায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর অর্পণ করেন।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৪

২০। المقالة: "ذات يوم 27 نوفمبر 1926 طاغور يبدأ زيارته لمصر" لسعيد الشحات' الجريدة: اليوم السابع في المصر بتاريخ: 27/11/2017

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় যে, এ মহান দায়িত্ব কবির সাহিত্যজীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। এ সময় তিনি বিভিন্ন জায়গায় প্রজাদের কল্যাণার্থে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন: কৃষির সার্বিক উন্নয়ন, গরিব কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা প্রদান এবং কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এছাড়াও জনকল্যাণে পল্লীসমিতি এবং সমবায় সমিতি গঠনের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[২১] ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শান্তিনিকেতনের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রের সহায়তায় " পল্লীসংগঠন কেন্দ্র" নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষির উন্নতিসাধন, ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণ, চিকিৎসার সুব্যবস্থাকরণ এবং গ্রামের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ছিল এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ১৯২৩ খ্রি. রবীন্দ্রনাথ এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'শ্রীনিকেতন'।[২২]

২১। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ: কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫
২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী (১৮৬১-১৯৪১), উকিপিডিয়া

৪র্থ পরিচ্ছেদ

উপাধি লাভ ও অর্জন এবং শেষ জীবন

ক) আহমাদ শাওকী ১৯১৯ সালে দেশে ফিরে রাজনীতির ব্যাপক পট পরিবর্তন দেখতে পান। এ সময় তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রাযোগ হয়। তিনি জনগণের মুখপাত্র হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। জনগণের মাঝে জাতীয় চেতনার অনুভূতি জাগ্রতকরণে সচেষ্ট হন। দেশের মানুষের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক উন্নয়নে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। এ ধরনের সংস্কারমূলক কবিতায় মুগ্ধ হয়ে আরব দেশের সাহিত্যিক ও প্রতিনিধিগণ আহমাদ শাওকীর কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মিসরের শাহী অপেরা হাউজে এক বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করে।[২৩] মিশরের জাতীয় কবি হাফিজ ইব্রাহিম দীর্ঘ কাসীদা আবৃত্তির মাধ্যমে শাওকীর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং বলেন:

' أمير القوافى قد أتيت مبايعا و هذى وفود ا لشرق قد بايعت معى'

'হে ছন্দের রাজা! আমি আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করতে এসেছি এবং আমার সাথে প্রাচ্য জগতের এ বিশাল সাহিত্যানুরাগীর দলও আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করছে'। [২৪]

উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে "أمير الشعراء" "আমীরুশ শুয়ারা" বা কবিকুল সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন।[২৫] এ জাতীয় সম্মাননা কবিকে আরো মর্যাদাবান ও সম্মানীত করেছে। এটি ছিল আহমাদ শাওকীর সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মাননা ও স্বীকৃতি।

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে 'গীতাঞ্জলি'[২৬] রচনার জন্য সর্বপ্রথম সার্বজনীন গৌরব লাভ করেন। তিনি যে বিশ্বকবি হিসেবে সর্বত্র প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল এই 'গীতাঞ্জলি'। ১৯১৩ খ্রি. সুইডিশ অ্যাকাডেমি[২৭]

২৩। আহমাদ কাব্বিশ, তারীখুশ-শি'রিল আল আরবি আল হাদিস (বৈরুত: দারুল ফিল, ১৯৭১), পৃ. ৭৪-৭৫

২৪। ড. শাওকী দাঈফ, আল আদব আল আরবি আল মু'য়াসির ফি মিসর, পৃ. ১১৩

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

২৬। গীতাঞ্জলি (রচনাকাল: ১৯০৮-১৯০৯ খ্রি.) রবীন্দ্রনাথের অন্যতম একটি কাব্যগ্রন্থ। একে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতি কবিতার সংকলন গ্রন্থও বলা হয় থাকে। The Song Offerings নামে কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। এ গ্রন্থের কবিতাগুলো ভক্তিমূলক রচনা। এখানে কবিতার সংখ্যা ১৭৫টি। সূত্র: বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২ (২য় সংস্করণ)

২৭। রাজা গুস্তাভ তৃতীয় ১৭৮৬ সালে সুইডেনের রাজকীয় অ্যাকাডেমি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। সুইডিশ অ্যাকাডেমি প্রতিবছর সাহিত্যে নোবেল বিজয়ীকে নির্বাচন করে থাকে। সদর দপ্তর: স্টকহোম। সূত্র: সুইডিশ অ্যাকাডেমি উকিপিডিয়া।

তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি গদ্যানুবাদ এর জন্য তাঁকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় পুরস্কার নোবেল প্রাইজে[২৮] ভূষিত করেন।[২৯] এর ফলে স্বদেশে যেমন তাঁর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাতি লাভ হয়। দেশে ও বিদেশে তাঁকে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং নবীন ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করে।[৩০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি উপাধিতে ভূষিত করেন পণ্ডিত রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।[৩১] ১৯১৫ সালে যুক্তরাজ্যের রাণীর দেওয়া অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মানজনক 'স্যার' (knigh) খেতাব দেওয়া হয় তাকে। উল্লেখ্য যে, প্রথম বাঙালি হিসেবে 'নাইট' [৩২] খেতাব পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আরো উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বাঙালি এবং প্রথম ও একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে এ গৌরবময় উপাধি অর্জন করেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ফজলে হাসান আবেদ। এছাড়াও ২০১৭ সালে বাঙালিদের মধ্যে 'নাইট' খেতাবে ভূষিত হন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জনাব আখলাকুর রহমান চৌধুরী। দেশটির হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে তাঁকে এ উপাধি দেওয়া হয়। [৩৩] এছাড়াও কবিকে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ডিসেম্বর ১৯১৩ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ খ্রি. ভারতের বারাণসীতে অবস্থিত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁকে ডি. লিট উপাধি প্রদান করা হয়। জুলাই ১৯৩৬ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আগস্ট ১৯৪০ খ্রি. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বকবিকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। [৩৪]

২৮। ১৯০১ সাল থেকে প্রতিবছর গবেষণা, উদ্ভাবণ ও মানব কল্যাণে অসামন্য অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। যা বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক ও গৌরবময় পুরস্কার হিসেবে বিবেচিত। ছয়টি বিষয়ের ওপর বিশেষ কৃতিত্বের জন্য এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিষয়গুলো হলো: পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র, অর্থনীতি, সাহিত্য ও শান্তি। সুয়েডীয় বিজ্ঞানী আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেল এ পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। সূত্র: উকিপিডিয়া

২৯। www.nobelprize.org

Prize motivating: because of his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse, by which with consummate skill he has made his poetic thought, expressed in his own English words, a part of the literature of the west.

৩০। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (কলকাতা: মডার্ণ এজেন্সী প্রাইভেট লি. ১৯৯৮), পৃ: ৫৫৭-৫৫৮।

৩১। Sophia Newspaper, 1 September 1900, Article Title: The World Poet of Bengal by Bromhabandob Upaddoy.

৩২। দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ৩, ২০১৭।

৩৩। Oxford dictionary: A man who has been given a special honour by the king of queen and has the title Sir before his name. Page: 851

৩৪। শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেনসহ প্রমূখ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পৃ. ৪৭২-৪৭৩

ক) আহমাদ শাওকী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কবিতা লেখায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৯১৯-১৯৩২ খ্রি. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালটি ছিল শাওকীর সাহিত্যাঙ্গনের অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল সময়। এ সময় তিনি ৬টি কাব্য-নাট্য, ১টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

অবশেষে ১৯৩০ খ্রি. তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৩২ সালের ১৩ অক্টোবর জন্মস্থান কায়রোতে ৬৪ বছর বয়সে কবি আহমাদ শাওকী ইন্তেকাল করেন। [৩৫]

খ) জীবনের শেষ চার বছর (১৯৩৭-১৯৪১ খ্রি.) ছিল রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক শারীরিক অসুস্থতার সময়কাল। ১৯৩৭ খ্রি. তিনি একবার অজ্ঞান হয়ে পড়ায় আশঙ্কজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। সেবার তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেছিলেন। তবে ১৯৪০ খ্রি. তিনি আবার মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এত অসুস্থতার মধ্যেও সাহিত্যচর্চা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেনি সাহিত্যপ্রেমিক রবিন্দ্রনাথকে। তিনি এ অবস্থায় 'রোগশয্যায়' (১৯৪০). 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'ছড়া' (১৯৪১) ও 'শেষ লেখা' (১৯৪১), 'স্ফুলিঙ্গ' (১৯৪৫) ও 'বৈকালী' (১৯৫১) কাব্যগ্রন্থসমূহের কাজ শেষে করেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৪১ খ্রি. জোড়াসাঁকোর বাসভবনেই এ কিংবদন্তি কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৩৬]

৩৫। ড. শাওকী দাইফ, আল আদাব আল আরবি আল মুয়াসির ফি মিসর, পৃ: ১১৩।

৩৬। শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেনসহ প্রমূখ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পৃ. ৪৭৩-৪৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবিতায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের অবদান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনধারায় যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, তার প্রভাব এসে পড়ে বাঙালি ও আরবজাতির সমাজ জীবনে। তখন থেকে এ দুই জাতির সাহিত্য চর্চার বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন কবিদের প্রথাগত নিয়মের পরিবর্তে আধুনিক যুগের কবিরা আরবি ও বাংলা কবিতায় মানুষের সমাজ, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন ইত্যাদিকে উপজীব্য করে কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। বাঙালি ও আরবজাতির সমাজ চিত্র কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব যে দু'জন লেখক কাঁধে নিয়েছিলেন, তাদের একজন হলেন অন্যতম মিশরীয় কবি আহমদ শাওকী। তিনি ছিলেন আরবি কবিতার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ও আরবজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও তিনি তাঁর বিভিন্ন দেশ সফরের সামাজিক অভিজ্ঞতা কবিতায় চমৎকারভাবে চিত্রায়িত করেছেন। কবিতার মাধ্যমেই তিনি মিশরের জনগণের জাতীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। তিনি জনসাধারণের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতি ইত্যাদি মৌলিক অধিকার আদায়ে জোড়ালো ভাষায় কবিতা রচনা করেন। এ মহান কবির সংস্কারমূলক কবিতায় মুগ্ধ হয়ে আরব বিশ্বের কবি সাহিত্যিগণ তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। উল্লেখ্য যে, রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নেওয়ার গুরুভার গ্রহণ করেছিলেন; মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যকে বিদ্রোহের আদলে উপস্থাপন করেছেন; আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় মানবাচরণের বিষয়সমূহ বিশেষ করে সমাজ ও সমকালের বিষয়াবলি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা উভয়ের স্ব স্ব দেশ ও জাতির মনের আবেগ ও অনুভূতি, দেশাত্মবোধ এবং নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ক উপস্থাপনা সকলকে বিমোহিত করে। সমাজের সকল অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তারা ছিলেন সোচ্চার। সমাজে ন্যায়-নীতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় তাদের কবিতা অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিল। কবিতার মাধ্যমে তাঁরা একটি বৈষম্যমুক্ত শান্তির সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন।

সে সময় তাঁরা তাদের কবিতার মাধ্যমে গণসচেতনতামূলক একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। কবিতায় আহমাদ শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১ম পরিচ্ছেদ

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্য গ্রন্থাবলী

ক) আরবি সাহিত্যের সকল অঙ্গনে কবি আহমাদ শাওকীর পদাচরণা রয়েছে। তিনি কবিতা ছাড়াও প্রবন্ধ, গদ্য, নাটক ও শিশু সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করেন। আহমাদ শাওকীর রচিত কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে "আশ শাওক্বিয়্যাত" অন্যতম। তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর ধারাবাহিক বিবরণ নিম্নরূপ।

১। আশ-শাওক্বিয়্যাত: এটি আহমাদ শাওকীর চার খণ্ডে রচিত দীওয়ান বা কাব্য সংকলন।

খণ্ড সংখ্যা	প্রকাশকাল	বিষয়বস্তু
প্রথম খণ্ড	প্রথম মুদ্রন : ১৮৯৮ খ্রি. দ্বিতীয় মুদ্রন: ১৯২৫ খ্রি.	স্তুতি, শোকগাথা, সঙ্গীত, কাহিনীকাব্য, রাজনীতি, ইতিহাস ও সমাজবিষয়ক কবিতাসমূহ এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে।
দ্বিতীয় খণ্ড	১৯৩০ খ্রি.	বর্ণনামূলক কবিতা, প্রেমের কবিতা এবং ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজবিষয়ক কিছু বিক্ষিপ্ত কবিতা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে।
তৃতীয় খণ্ড	১৯৩৬ খ্রি.	শুধু শোকগাঁথা কবিতাসমূহ এ খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
চতুর্থ খণ্ড	১৯৪৩ খ্রি.	এতে বিবিধ বিষয়ের কবিতা বিশেষ করে শিক্ষামূলক ও উপদেশমূলক কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে।

২। দুওয়ালুল 'আরাব ওয়া উযামাউল ইসলাম: (আরব রাষ্ট্রসমূহ ও ইসলামের মহান ব্যক্তিবর্গ) এটি একটি ঐতিহাসিক কাব্য সংকলন। এতে ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিম মনীষীদের জীবনী রয়েছে। বিশেষ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন চরিত বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় তিনি এ গ্রন্থে রচনা করেন। গ্রন্থটি কবির মৃত্যুর পর ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৩। কাব্যনাট্যাবলী: আহমাদ শাওকীর জীবনের শেষ চার বছরে (১৯২৯ খ্রি.-১৯৩২ খ্রি.) ছয়টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত এ ছয়টি কাব্যগ্রন্থ কাহিনী সংবলিত হওয়ায় এসব কাব্য আরবি সাহিত্যে কাব্যনাট্য হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে "আস-সিত্তু হুদা" কাব্য নাট্যটি কমেডি বা হাস্যরসাত্মকমূলক। অবশিষ্ট পাঁচটি ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত কাব্যনাটক। এ কাব্যনাট্যের মাধ্যমে শাওকী সে সময়ের সমাজ জীবন, প্রেম ও রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র কাব্যিক ভাষায় চিত্রায়িত করেছেন। নিম্নে আহমাদ শাওকীর রচিত কাব্যনাট্যসমূহের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হলো।

রচিত কাব্যনাট্য	প্রকাশকাল	বিষয়বস্তু
১। মাছ্‌রা'উ কিলিউবাতরা (ক্লিওপেট্রার পতন)	১৯২৯ খ্রি.	খ্রিষ্টপূর্ব ৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার সাথে রোমান সেনাপতি এ্যান্টনীর প্রেম ও তার পরিণতি এ কাব্যনাট্যের মূল উপজীব্য।
২। মাজনূন লাইলা	১৯৩১ খ্রি.	এটি উমাইয়াদের আমলে নাজ্‌দ ও হেজাজের একটি কাহিনী সম্বলিত নাট্য কবিতা। কায়েস ও লায়লা একে অপরকে খুব ভালোবাসত। পারিবারিক সম্মতি না থাকায় লায়লার অন্যত্র বিবাহ হয়ে যায়। এতে শোকে তারা উভয়ে অসুস্থ হয়ে কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করে। এ বিয়োগান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ নাট্য কবিতাটি রচিত হয়েছে।
৩। কাম্‌বীজ	১৯৩১ খ্রি.	১৯২১ খ্রি. ফরাসি রাজাদের মিশর বিজয়ের ওপর লেখা কাহিনী কাব্য। কাম্‌বীজ পারস্য সম্রাটের নাম। তিনি মিশরের ফেরাউন আমাযীস কন্যা নেফ্‌রেতকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে নেফ্‌রেত তা প্রত্যাখ্যান করে। এ দিকে পূর্ববর্তী ফেরাউন কন্যা

		নাতীতাস নিজেকে 'নেফতাস' ছদ্মনাম ধারণ করে কামবীযের স্ত্রী হিসেবে উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে কাম্বীজ এ প্রতারণার সংবাদ জানতে পেরে ক্ষুদ্ধ হয়ে মিশর আক্রমণ করে লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ ধরনের ধ্বংসাত্নক কার্য নিয়েই এ কাব্যনাট্যটি রচিত হয়েছে।
৪। আলী বেক আল-কাবির (মহান আলী বেক)	১৯৩২ খ্রি.	আলী বেক একজন মামলূক শাসক। তিনি অটোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এ পর্যায়ে তাঁর নিজস্ব আত্নীয়স্বজনদের বিশ্বাসঘাতকার কারণে তিনি এ বিদ্রোহে ব্যর্থ হন। এ কাহিনী নিয়ে আলী বেক আল কাবির কাব্যনাট্যটি রচিত।
৫। আস-সিত্তু হুদা (ম্যাডাম হুদা)	১৯৩২ খ্রি.	এটি একটি কমেডি বা হাস্যরসাত্নক কাব্যনাট্য। এতে এক ধনাঢ্য কৃপণ মহিলার চরিত্র চিত্রিত করা হয়েছে। এ মহিলার ধারণা ছিল মানুষ তাকে ধন-সম্পদের জন্য বিয়ে করবে। একে একে নয়জন পুরুষ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সে সকল পুরুষদের চরিত্র নিয়ে তামাশা করেন এবং তাদের হেয় প্রতিপন্ন করেন।
৬। আন্তারা	১৯৩২খ্রি.	আন্তারা শাওকীর রচিত সর্বশেষ কাব্যনাট্য। আন্তারা ও আব্লা চাচাতো ভাইবোন। তারা একে অপরকে ভালোবাসত। আব্লার বাবা তাকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ প্রেম-কাহিনীর বিষয়বস্তু নিয়েই এই কাব্যনাট্যটি রচিত। [৩৭]

৩৭। আহমাদ কাব্বিশ, তারীখুশ-শি'রিল আল আরবি আল হাদিস (বৈরুত: দারুল ফিল, ১৯৭১), পৃ. ৭৫-৭৬, ৮৪-৮৫

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫৬টি। মাত্র বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে আশি বছর পর্যন্ত তিনি সাহিত্য চর্চায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রাণশক্তির প্রাচুর্যতা, অধিক মানসিক প্রেরণা, বিস্তৃত আবেগের গভীরতা এবং অপরিসীম প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর কাব্যচর্চায় শক্তি ও উৎসাহ যুগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ সময়ের কাব্য চর্চার মাধ্যমে সমাজের সব মানুষের সকল বিষয় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতার মাধ্যমে সমাজের মানুষদের রাজনৈতিকভাবে করেছেন সচেতন। তিনি কথা বলেছেন সামাজিক সকল বৈষম্য, নিপীড়ন ও অসমতার বিরুদ্ধে। তিনি সর্বদা ছিলেন মাজলুমদের পক্ষে। তাঁর কবিতা ছিল সকল অসঙ্গতির বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন সমাজের মানবীয় প্রেম, প্রকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, মৃত্যুচিন্তা ইত্যাদি বিষয়াবলী কাব্যিক ছন্দে চিত্রায়িত করতে। সুদীর্ঘ কাব্যিক জীবনে কবির উপলব্দি ও চেতনার জগৎ সমৃদ্ধ ছিল। বাংলা সাহিত্যের কাব্যিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘ কাব্যজীবনে বৈশিষ্ট্যগত ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর রচনাবলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা য়ায়। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো:

রচনার পর্ব	রচিত কাব্যগ্রন্থাবলি	প্রকাশ কাল	বিষয়বস্তু
১। সূচনা পর্ব (১৮৭৮-১৮৮২খ্রি.)	ক) রুদ্রচণ্ড	১৮৮১ খ্রি.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য পরিক্রমার প্রথম চার বছরকে সূচনা পর্ব বলা হয়। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলির বিষয় ছিল গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য।
	খ) বাল্মিকী প্রতিভা	১৮৮১ খ্রি.	
	গ) কালমৃগয়া	১৮৮২ খ্রি.	
২। উন্মেষ পর্ব (১৮৮২-১৮৮৬ খ্রি.)	ক) সন্ধ্যাসঙ্গীত	১৮৮২ খ্রি.	এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যধারার যথার্থ বিকাশ শুরু হয়। এ সময়
	খ) প্রভাত সঙ্গীত	১৮৮৩ খ্রি.	
	গ) শৈশবসঙ্গীত	১৮৮৪ খ্রি.	

	ঘ) ছবি ও গান	১৮৮৪ খ্রি.	তাঁর ৬ (ছয়টি) কাব্য গ্রন্থ রচিত হয়।
	ঙ) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	১৮৮৪ খ্রি.	
	চ) কড়ি ও কোমল	১৮৮৬ খ্রি.	
৩। ঐশ্বর্য পর্ব (১৮৯০-১৮৯৬ খ্রি.)	ক) মানসী	১৮৯০ খ্রি.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৩০ (ত্রিশ) থেকে ৩৫ (পয়ঁত্রিশ) বছর বয়সে রচিত গ্রন্থাবলী। একে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে শিল্পরূপ, আবেগ, রোমান্টিকতা ও গভীর প্রত্যয়ের সমন্বয় এ পর্বে বেশি পরিলক্ষিত হয়।
	খ) সোনার তরী	১৮৯৪ খ্রি.	
	গ) চিত্রা	১৮৯৬ খ্রি.	
	ঘ) চৈতালী	১৮৯৬ খ্রি.	
	ঙ) নদী	১৮৯৬ খ্রি.	
৪। অন্তবর্তী পর্ব (১৮৯৯-১৯১০ খ্রি.)	ক) কণিকা	১৮৯৯ খ্রি.	এ পর্বে রবীন্দ্রনাথের ৯টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ এ পর্বের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ম। ইতিহাস, প্রেম সৌন্দর্য, মাতৃহারা শিশুমনের কথা কাব্যিকরূপে চিত্রিতকরণ, স্ত্রীবিয়োগ ব্যাথা ইত্যাদি এ পর্বের কাব্যগ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু।
	খ) কথা	১৯০০ খ্রি.	
	গ) কাহিনী	১৯০০ খ্রি.	
	ঘ) কল্পনা	১৯০০ খ্রি.	
	ঙ) ক্ষণিকা	১৯০০ খ্রি.	
	চ) নৈবেদ্য	১৯০১ খ্রি.	
	ছ) স্মরণ	১৯০২ খ্রি.	
	জ) শিশু	১৯০৬ খ্রি.	
	ঝ) খেয়া	১৯১০ খ্রি.	
৫। গীতাঞ্জলি পর্ব	ক) গীতাঞ্জলি	১৯১০ খ্রি.	এ পর্বকে আধ্যাত্মিক পর্বও

(১৯১০-১৯১৫ খ্রি.)	খ) গীতিমাল্য	১৯১৪ খ্রি.	বলা যায়। এ পর্বে রচিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সার্বজনীন গৌরব লাভ করেন। নীতিবাদ বা সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণমূলক ধর্মসাধনা এ পর্বের মূল উপজীব্য বিষয়।
	গ) উৎসর্গ	১৯১৪ খ্রি.	
	ঘ) গীতালি	১৯১৫ খ্রি.	
৬। বলাকা পর্ব (১৯১৬-১৯২৯ খ্রি.)	ক) বলাকা	১৯১৬ খ্রি.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশনার সর্বশেষ পর্ব। জাগ্রত জীবনবোধ, মর্ত্যধরিত্রীর রূপ, রঙিন যৌবনের বর্ণনা, আবেগ-আসক্তি ইত্যাদি ছিল এ পর্বের কবিতার মূলবিষয়।
	খ) পলাতকা	১৯১৮ খ্রি.	
	গ) শিশু ভোলানাথ	১৯২২ খ্রি.	
	ঘ) পূরবী	১৯২৫ খ্রি.	
	ঙ) মহুয়া	১৯২৯ খ্রি.	
	চ) লেখন	১৯২৭ খ্রি.	
	ছ) চিত্রবিচিত্র	১৯২৯ খ্রি.	
৭। অন্ত্য পর্ব (১৯২৯-১৯৪১ খ্রি.)	ক) বনবানী	১৯৩১ খ্রি.	বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পর্বের কাব্য গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করেন। এ সময়টাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজের প্রকাশকাল বললেও অত্যুক্তি হবে না।
	খ) পরিশেষ	১৯৩২ খ্রি.	
	গ) পুনশ্চ	১৯৩২ খ্রি.	
	ঘ) বিচিত্রিতা	১৯৩৩ খ্রি.	
	ঙ) শেষ সপ্তক	১৯৩৫ খ্রি.	
	চ) বীথিকা	১৯৩৫ খ্রি.	
	ছ) পত্রপুট	১৯৩৬ খ্রি.	
	জ) শ্যামলী	১৯৩৬ খ্রি.	

	ঝ) খাপছাড়া	১৯৩৭ খ্রি.	
	ঞ) ছড়া ও কবি	১৯৩৭ খ্রি.	
	ট) প্রান্তিক	১৯৩৮ খ্রি.	
	ঠ) সেঁজুতি	১৯৩৮ খ্রি.	
	ড) প্রহাসিনী	১৯৩৯ খ্রি.	
	ঢ) আকাশ প্রদীপ	১৯৩৯ খ্রি.	
	ণ) নবজাতক	১৯৪০ খ্রি.	
	ত) সানাই	১৯৪০ খ্রি.	
	থ) রোগশয্যায়	১৯৪০ খ্রি.	
	দ) চিত্রলিপি	১৯৪০	
	ধ) আরোগ্য	১৯৪০	
	ন) জন্মদিনে	১৯৪১ খ্রি.	
৮। মৃত্যুর পর প্রকাশিত	ক) ছড়া	১৯৪১ খ্রি.	রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এ কাব্যগ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়।[৩৮]
	খ) শেষ লেখা	১৯৪১ খ্রি.	
	গ) স্ফুলিঙ্গ	১৯৪৫ খ্রি.	
	ঘ) বৈকালী	১৯৫১ খ্রি.	

৩৮। ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৬৯-৪৮২; আবু ইসহাস ইভান, রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ২২

২য় পরিচ্ছেদ

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল উপজীব্য/ বিষয়বস্তু

ক) আহমাদ শাওকী সমসাময়িক মিশরের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়কে মূল উপজীব্য করে কবিতা রচনা করেন। তিনি সে সময়কালের খেদীভ শাসকদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। নিজ পরিবার ও সে সময়ের মিশরের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও কবি-সাহিত্যিকদের নামে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। প্রাচীন আরব কবিদের অনুসরণে প্রেমকাব্যও রচনা করেছেন। ধর্মীয় চেতনাও আহমাদ শাওকীর কবিতার অন্যতম বিষয়বস্তু হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে বিভিন্ন সামাজিক কবিতা ও বর্ণনামূলক কবিতা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মিশরের জনগণ ছিল পরাধীন এবং নানা প্রকার কুসংস্কারে নিপতিত। পরাধীনতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির জন্য সংস্কার আন্দোলনকে মুল উপজীব্য করেও তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। তিনি কবিতার ছন্দে মিশরীয় জনগণকে অধিকার আদায়ে সংগ্রামী ও উৎসাহী করে তোলেন। আহমাদ শাওকীর কবিতার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

১। স্তুতি বা প্রশংসামূলক কবিতা:

আহমাদ শাওকী স্তুতি বা প্রশংসাকে উপজীব্য করে বিভিন্ন সময় কবিতা রচনা করেন। বিশেষ করে সমসাময়িক মিশরীয় খেদীভ শাসক ইসমাঈল, তাওফীক, আব্বাস, হোসাইন ও ফুয়াদ প্রমূখের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। এ ধরনের কবিতা রচনায় আহমাদ শাওকী প্রাচীন কবিদের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির অনুসরণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর আব্বাসীয় যুগের কবি মুতান্নাবিকে বিশেষভাবে অনুসরণের বিষয় পরিলক্ষিত হয়। মাত্র ১৪ বছর বয়সে আহমাদ শাওকী তাঁর প্রথম যে কবিতাটি রচনা করে তা ছিল স্তুতিমূলক। কবিতাটি তিনি খেদীভ তাওফীক পাশার প্রশংসায় রচনা করেন। এ স্তুতিমূলক কবিতার মাধ্যমে শাওকী খেদীভ রাজদরবারে নিজের একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছিলেন।[৩৯]

৩৯। আহমদ কাব্বিশ, তারীখ আশশা'আরি আল আরবি আল হাদিস, পৃ. ৭৬

২। শোকগাথামূলক কবিতা:

আহমাদ শাওকী তাঁর পরিবারের মা-বাবা ও দাদীর নামে শোকগাথা রচনা করেন। খেদীভ তাওফীক ও মিশরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেমন মুস্তফা ফাহ্মী, রিয়ায পাশা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কতিপয় বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক যেমন হাফিজ ইব্রাহিম, ইয়াকূব সার্রূপ, ভিক্টর হোগো, টলস্টয় ও মানফালূতী প্রমূখের নামে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। [৪০]

৩। প্রেমমূলক কবিতা:

আহমাদ শাওকীর হৃদয়ে নারী প্রেম প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে ১৮৮৭ খ্রি. ফ্রান্স গমনের পর ফরাসীদের প্রভাবে তিনি প্রেমময় কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। 'বারীস' ও 'গাবা বোলোনিয়া' প্রভৃতি শিরোনামের প্রেমের কবিতা ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রেমের কবিতা। [৪১]

৪। আত্মগৌরব ও খাম্রিয়্যাত বিষয়ক কবিতা:

আহমাদ শাওকী নিজের গৌরব ও উচ্চাভিলাষিতাকে উপজীব্য করে আত্মগৌরবমূলক কবিতা রচনা করেন। এছাড়াও তিনি আব্বাসী যুগের কবি আবু নাওয়াসের অনুকরণে খামরিয়্যাত বা মদ বিষয়ক কবিতা রচনা করেন। [৪২]

৫। বর্ণনামূলক কবিতা:

আহমাদ শাওকী বিভিন্ন বিষয়কে উপজীব্য করে বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করেন। তাঁর বর্ণনামূলক কবিতার পূর্ববতী কবিদের কবিতা চেয়ে কিছুটা ভিন্নতর ছিল। তাঁর বর্ণনামূলক কবিতাগুলো নিম্নরূপ:

ক) বিধ্বস্ত নগরী ও তার ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা দিয়ে তিনি রচনা করেন 'আন নীল' 'আল আন্দালুসিয়া আল জাদিদ' 'আন্দালুসিয়া' ইত্যাদি কবিতা।

খ) জাপানের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার বর্ণনা দিয়ে রচনা করেন 'তুকয়ু' নামক কবিতা।

গ) দামেস্ক ও বৈরুত নগরীর দুর্যোগ-দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে রচনা করেন 'নাকবাতু বৈরুত' ও 'নাকবাতু দিমাশ্ক' নামক কবিতা।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৪১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৪২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

ঘ) বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার যেমন উড়োজাহাজ ও সাবমেরিনকে কবিতার বিষয়বস্তু করে কবিতা রচনা করেন। 'ওয়াসফুল গাওয়াসাত ও নাকবাতুল বাখিরাহ লুযতানিয়া' নামক কবিতা।

ঙ) সমাজ জীবনের বিভিন্ন উপায় উপকরণ যেমন রঙ্গমঞ্চ, বিনোদনকেন্দ্র ইত্যাদিকে উপজীব্য করে রচনা করেন 'ওয়াসফু মারকাস' 'মারকাস' নামক কবিতা।

চ) আধুনিক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, রেডক্রস, রেডক্রিসেন্ট ইত্যাদির উপকারিতা নিয়ে রচনা করেন 'আল হেলালুল আহমার আস্সালিবুল আহমার', 'আল হেলাল ও আস্সালিব আল আহমারানি' 'ব্যাংকু মিসর' ইত্যাদি নামক কবিতা।

ছ) আহমাদ শাওকী মুসলিম স্পেন সম্পর্কে বর্ণনামূলক কিছু কবিতা রয়েছে। তন্মধ্যে 'আল-আন্দালুস আল-জাদীদাহ', আল-আন্দালুল আল-কাদীমাহ, 'আর রেহলাতু ইলাল আন্দালুস' উল্লেখযোগ্য।

জ) প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ বর্ননা দিয়ে তিনি 'আর রাবিয়ু ওয়া ওদিল নীল', ' আল হেলাল', 'মানজারু তুলুয়িল বাদরে মিন সাফিনাহ' নামক বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন।[৪৩]

৬। ধর্মীয় অনুভূতি বিষয়ক কবিতা:

ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা আহমাদ শাওকীর কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি কখনো দীর্ঘ কবিতা আবার কখনো খণ্ড কবিতার মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে তাওহীদ, রিসালাত, কোরআন, তাকদীর, মৃত্যু, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয় ফুটিয়ে তোলেন।[৪৪] ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা বিষয়ক তাঁর কবিতাসমূহ:

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৯
৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

কবিতার শিরোনাম	প্রকাশকাল	আলোচিত বিষয়
ক) আল-বুরদা	১৯১০ খ্রি.	মিশরের খেদীভ শাসক দ্বিতীয় আব্বাসের পালনকৃত হজ্জ উপলক্ষে রচিত কবিতা। শ্লোক সংখ্যা ১৯০।
খ) যিকরাল মাওলিদ (জন্মস্মৃতি)	১৯১১ খ্রি.	প্রণয়-মুখবন্ধ দিয়ে শুরু করে এতে রাসূল (স.) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। এ কবিতার শ্লোক সংখ্যা ৯৯।
গ) আল্-হাম্যিয়্যাতুন নাবাবিয়্যাহ (হাম্যা অন্ত্যমিলবিশিষ্ট নবী কাব্য)	১৯১৭ খ্রি.	এ কবিতায় রাসূল (স.) এর জন্মের বিবরণ ও মি'রাজের ঘটনাসহ তাঁর বিভিন্ন মোজেযা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর সুন্দর সাবলীল প্রশংসা স্থান পেয়েছে। এর শ্লোক সংখ্যা ১৩১টি।
ঘ) দুওয়ালুল আরাব ওয়া উযামাউল ইসলাম	১৯৩৩ খ্রি.	এতে তিনি ইসলামের আবির্ভাব থেকে মিশরের ফাতিমীয় রাষ্ট্রের পতন পর্যন্ত মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। আরবি ভাষা, পবিত্র কাবা, রাসূল (স.), খোলাফায়ে রাশেদীন, বনু উমাইয়া এবং আব্বাসীয় ও ফাতিমীয় খলিফাদের জীবনচরিত ইত্যাদি আলোচনা কাব্যিক আকারে উপস্থাপন করেছেন। এর শ্লোক সংখ্যা ১৫৩ টি।

ঙ) কিবারুল হাওয়াদিছ ফী ওয়াদিন নীল (নীল উপত্যকায় বড় বড় ঘটনা)	১৮৯৪ খ্রি.	১৮৯৪ খ্রি. জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ সম্মেলনে এ কবিতাটি আহমাদ শাওকী আবৃত্তি করেছিলেন। এ কবিতার শুরুতে জাহাজ, সমুদ্র ও তার তরঙ্গের একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা স্থান পেয়েছে। কবিতার শেষে তিনি আল্লাহর নিকট জাহাজের যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন।[৪৫]

৭। দেশাত্মবোধক কবিতা:

আহমাদ শাওকী স্পেনে নির্বাসিত থাকাকালে তাঁর জন্মভূমি মিশরের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও আন্তরিকতার টানে দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কবিতা রচনা করেন। তিনি মিশরকে বৈদেশিক শাসকের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করে মিশরবাসীকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করেন তাঁর অনুপ্রেরণামূলক দেশাত্মবোধক কবিতার মাধ্যমে।

كبار الحوادث فى وادى النيل، ذكرى المولد ، مصر تجد نفسها بنسائها المتجددات، مصر، ইত্যাদি আহমাদ শাওকীর দেশাত্মবোধক উল্লেখযোগ্য কবিতা। [৪৬]

৮। সামাজিক প্রেক্ষাপট: সামাজিক সংস্কারে শাওকীর কবিতা যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছিল। তিনি কবিতার মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা, নারী অধিকার ও নারী শিক্ষা, নারীদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, শ্রমিকদের সমস্যা ও তাদের মর্যাদা ইত্যাদি তুলে ধরেন। তিনি ছাত্রদের জন্য উপদেশমূলক কবিতা এবং সমাজ থেকে অন্যায় ও অনাচার দূরীকরণে সমাজ সচেতনতামূলক কবিতা রচনা করেন।

أيها العمال، الله و العلم، بين الحجاب و السفور، العلم و التعليم و واجب المعلم ইত্যাদি তাঁর সামাজিক বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কবিতা। [৪৭]

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২

৪৭। হান্না আল ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরবী, পৃ. ৯৯৪-৯৯৫

খ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমসাময়িক ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, প্রেম, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মূল উপজীব্য করে কবিতা রচনা করেন। তিনি সে সময় ইংরেজদের দুঃশাসন ও দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কবিতা লেখেন। প্রকৃত বাঙালি হিসেবে এ দেশের প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি এক ধরনের আন্তরিক টান রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' যা এখন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-মাধুর্য কবি মনকে দারুণভাবে উদ্বেলিত করেছিল। এ দেশের ষড়ঋতুর রঙ ও রূপের চিত্র অংকন করেছেন 'বর্ষা' নামক কবিতায়। ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার চেতনা তাঁর 'সোনার তরী' কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় প্রেমকে অন্যতম উপজীব্য করে বেশ কিছু কবিতা লিখে প্রেমের মর্মার্থ বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি নারীকুলের কোমল হৃদয়ের মানসিকতা নিয়ে বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। সামাজিক নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে ছোট ছোট কবিতায় তিনি সমৃদ্ধ করেছেন 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থখানি। জীবনের উচু-নিচু, উদারতা-সংকীর্ণতা, উত্তম-অধম, স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্ক এবং দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয় চিত্রিত করেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহে। রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহে কবির ভাবনা ও অনুভূতির বহি:প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১। রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক কবিতা: রাজনীতি ও ইতিহাসকে উপজীব্য করে এবং ভারতীয় ইতিহাসের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন কবিতা রচনা করেন। ইতিহাস আশ্রিত তাঁর দুটি প্রসিদ্ধ কবিতা হলো: 'গুরু গোবিন্দ' ও নিষ্ফল উপহার'। মোঘল সম্রাট আওরাঙ্গজেবের শাসনামলে উত্তর ভারতের অমুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনাকে অবলম্বন করে কবিতা দুটি রচনা করেন। ভারতের স্বাধীকার আন্দোলন বেগবান ও সুসংগঠিত করতে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় ' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। [৪৮] দেশের এই আন্দোলনে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধকরণ ও

৪৮। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল। ব্রিটিশ শাসন বিরোধি আন্দোলনের প্রথম ভারতীয় জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ব্রিটিশ আই. সি. এস. (অব.) অফিসার অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ১৮৮৫ সালে দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধি 'অসহযোগ আন্দোলনের' মাধ্যমে দলটি গণমানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেস দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে বিশ্বময় পরিচিত লাভ করে। তখন থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে নেহেরু-গান্ধী পরিবার দলটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। (সূত্র: বাংলাপিডিয়া ও উকিপিডিয়া)

নেতৃত্বের আদর্শিক ও নৈতিক উন্নতির দিক-নির্দেশনা প্রদান করে কবি 'গুরু গোবিন্দ' কবিতায় বলেন: [৪৯]

"কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব–
'পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ'।" -গুরু গোবিন্দ। [৫০]

২। প্রেম বিষয়ক কবিতা:

প্রেম বিষয়ক কবিতায় কবি প্রমাণ করেন যে, মানুষের দেহের সাথে প্রেমের সম্পর্ক অস্থায়ী। মন ও হৃদয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক হলো গভীর ও স্থায়ী। কেননা, মানুষের দেহের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু হৃদয়ের গভীরে থাকা প্রেম-ভালোবাসা কখনই নষ্ট হয় না। [৫১] এভাবেই প্রেমের বাস্তবতা চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেম বিষয়ক যথার্থতা বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন 'অনন্ত প্রেম' 'গুপ্ত প্রেম' 'ব্যক্ত প্রেম', 'ভর্ৎসনা' কবিতা। প্রেম বঞ্চিত অভিমানী নারীর নানা অভিযোগ নিয়ে রচনা করেন 'নারী উক্তি' কবিতাটি। ভালোবাসা হীন ও প্রেমহীন নারীর বিরক্তভাব ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'নারী উক্তি' কবিতায়:

" অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলে ও চলে, শুধু হাসি দিলে?" –'নারীর উক্তি'। [৫২]

এছাড়াও তিনি 'নিষ্ফল কামনা', 'পুরুষের উক্তি', 'সংশয়ের আবেগ' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের আদর্শিক রূপ বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত কবিতায় প্রেমকে উপজীব্য করে প্রেমকে দিয়েছে একটি মর্যাদার আসন।

৪৯। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ৪০-৪১
৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, (ঢাকা: জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, মে ২০১৩) পৃ. ৮৬
৫১। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ২৭
৫২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৪৬

৩। সামাজিক কবিতা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল সামাজিক অসংগতি। তিনি সমাজ বাস্তবতার শৈল্পিক চিত্র কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেছেন। সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরে বাঙালিদের সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি পুরো সমাজকে করেছিল ব্যাধিগ্রস্ত। ব্যাহত করেছিল সমাজ জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। পিছিয়ে দিয়েছিল সমাজের অগ্রগতি। কবি এসব কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি বাল্যবিবাহকে নিরুৎসাহিত করে বাঙ্গালী সমাজকে সচেতন করেছেন তাঁর 'বধূ' নামক কবিতায়। এ ধারার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো- 'পরিত্যক্ত', 'দেশের উন্নতি' 'দুরন্ত আশা' ইত্যাদি। [৫৩]

৪। ধর্মীয় কবিতা:

ধর্মীয় উন্মাদনা ও গোঁড়ামি উপেক্ষা করে, ধর্মীয় চেতনাকে বিষয়বস্তু করে, জগৎ স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন অসংখ্য ধর্মীয় কবিতা। পরধর্মের প্রতি নিন্দা ও অসহনশীল আচরণ থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়ে তিনি রচনা করেছেন 'ধর্মপ্রচার' শীর্ষক কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার চেতনা পরিলক্ষিত হয় 'সোনার তরী' নামক কবিতায়। এছাড়াও জগৎ সংসারের স্নেহ-প্রীতি, মায়া-ভালোবাসা, সৌন্দর্য-মুগ্ধতা, ইহকাল-পরকাল, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু বর্ণনা করে তিনি রচনা করেছেন 'আকাশের চাঁদ', 'দেউল', 'দুই পাখি' 'অক্ষমা', 'মায়াবাদ', 'দরিদ্রা', 'প্রতীক্ষা', '১৪০০ সাল' শীর্ষক প্রভৃতি কবিতাসমূহ।[৫৪]

৫। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিষয়ক কবিতা:

বাংলার প্রকৃতির বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। কবি বাংলার প্রকৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করে নিজস্ব অনুভূতি ও আবেগ অপূর্ব ছন্দে কাব্যে রূপায়িত করেছেন। বাংলার ষড়ঋতুর মধ্যে বর্ষা কবিকে বেশি আবেগ আপ্লুত করেছে। তিনি বর্ষা দিনের অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনাকে উপজীব্য করে রচনা করেছেন 'বর্ষার দিনে',

---

৫৩। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ৩৩, ৩৪

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৪০, ৫০-৫১

'আকাঙ্ক্ষা', 'মেঘের খেলা' প্রভৃতি কবিতা। কবি বলেন:

"এমন দিনে তারে বলা যায়,

এমন ঘনঘোর বরিষায়!

–বর্ষার দিনে। [৫৫]

বর্ষা নিয়ে কবির উল্লেখযোগ্য কবিতার মধ্যে রয়েছে-'মেঘদূত', 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'কুহুধ্বনি', প্রভৃতি। এছাড়াও মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতিকে অপূর্ব দার্শনিক যুক্তিতে কবি তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় কবি প্রকৃতিও মানব সম্পর্ক এক সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতি নিয়ে রচিত কবির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো: 'অহল্যার প্রতি'। 'বসুন্ধরা' নামের দীর্ঘ কবিতায় তিনি উদ্ভিদ, জীব ও জড়কে একসূত্রে বেঁধে জগৎ-সংসারের অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। [৫৬]

৬। গীতিকাব্য: রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্যের মধ্যে রয়েছে: 'হতভাগ্যের গান' 'সে আমার জননী রে' 'ভিখারি', 'যাচনা', 'বিদায়', 'লীলা' প্রভৃতি। এসব কবিতা কবির দৈনন্দিন অনুভূতি ও উপলব্ধি জীবনবোধ, প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ-বেদনা প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত। জীবনের সকল সুখ-সম্ভাবনা ছুড়ে ফেলে সংগ্রামমুখর নতুন জীবনকে বরণ করেছেন তাঁর 'বিদায়' কবিতায়। কবি বলেন:

ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো,
হউক সুন্দরতম
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়-
শুধু সমাপন।

–বিদায়। [৫৭]

মাতৃস্নেহের শাশ্বতরূপ 'সে আমার জননী রে' কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। [৫৮]

৫৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ১০৩

৫৬। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্ররাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ৩৭-৩৯, ৫৩

৫৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্পনা (ঢাকা: শব্দশিল্প, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৫৭

৫৮। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্ররাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ৯৭-৯৮

৩য় পরিচ্ছেদ

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

যুগের বিবর্তন ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। আহমাদ শাওকী প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা বর্জন করে আরবী সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রেম, আধ্যাত্মিকতা, শোঁকগাথা, বংশগৌরবের বর্ণনা ইত্যাদি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক যুগে কবিতা চর্চায় সামাজিক, রাজনৈতিক, দেশপ্রেম, ধর্মীয় চেতনা প্রভৃতি নতুন বিষয়বস্তু হিসেবে অনুসৃত হওয়ার পাশাপাশি কবিতার বৈশিষ্ট্য ও স্টাইলেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে আব্বাসী যুগের কবি আবু নাওয়াস, আবু ফিরাস ও আল-বুহতুরী প্রভৃতি কবির কবিতা শাওকীকে আকৃষ্ট করেছে। যেমন:

১। কবিতায় শব্দের প্রয়োগ ও পদ্ধতি: ক) আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতা রচনায় শব্দের প্রয়োগে ছিলেন যত্নশীল। তিনি আধুনিক, শ্রুতিমধুর, সহজ, সাবলীল ও বোধগম্য আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে প্রাচীন আরবি শব্দ কবিতায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন আদলে ও নতুন অর্থে ব্যবহার করে কবিতাকে সুরুচিপূর্ণ ও মাধুর্যময় করেছেন। পাঠক আকর্ষণে কবিতার প্রাথমিক চরণসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। আহমাদ শাওকী কবিতা রচনায় এমন শব্দ চয়ন ও বাক্যের বিন্যাস করতেন যে, তাঁর কবিতার কল্পিত চিত্র বাস্তব মনে হতো। যেমন তিনি কোন ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমে প্রাসাদের একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরেন। প্রাসাদটির অর্ধেক পানিতে ডুবে আছে। ভিতরে একটি ভীতিপূর্ণ পরিবেশ। ভাস্কর্যের এমনভাবে বর্ণনা দেন, যেন ভাস্কর্যটি সদ্য নির্মাণ করা হয়েছে। "আবুল হাওল", "আন-নীল", "আল আন্দালুস", "দিমাশক" "যাহলা" ইত্যাদি তাঁর অনবদ্য কবিতা। এ সকল কবিতায় কল্পনা ও ইতিহাস মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব-জীবনদর্শন কে প্রধান উপজীব্য করে কবিতা রচনা করেন। কবি মানবজীবনকে প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে কাব্য-ভাবনার এক নতুন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেন। কবিতাকে তিনি একটি সার্বজনীন মানবিকতা এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্কের সুদৃঢ় ভিত্তি হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়

রবীন্দ্র কাব্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি সর্বদা মানুষের জীবন-স্বভাবের চিত্রকে কাব্যাকৃতিতে উপস্থাপন করতেন। তাঁর মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা এবং ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থে এ ধরনের বিকশিত প্রতিভার উজ্জ্বল উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়।

২। কবিতা রচনায় প্রভাব:

ক) আব্বাসী যুগের বেশ কিছু কবির কবিতায় কবি আহমাদ শাওকী প্রভাবিত হয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবু নাওয়াস, আবু ফিরাস, আল বুহতরী প্রমূখ। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে আহমাদ শাওকী, আল বারূদীর স্টাইলের অনুসারী ছিলেন। রচনাশৈলী, শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসে তিনি আল-বুহতরীকে অনুসরণ করতেন। আহমাদ শাওকীর "শরাব" কাব্যে আবু নাওয়াসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি ফরাসী সাহিত্যিক হেগোর 'La Legende Siecles' কবিতায় প্রভাবিত হয়ে মিশরীয় ইতিহাস সম্পর্কিত " কিবারুল হাওয়াদিছ ফী ওয়াদি আন্ নীল" নামক কবিতা রচনা করেন। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় শাওকীর ক্লাসিক্যাল কবিতার ছাপ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। [৫৯]

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাব্যে সংস্কৃত ও মহাকবি কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্য-গীতিরস ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য মানসকে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে তাঁর পরিবার। সে সময় ঠাকুরবাড়ী হয়ে উঠেছিল জ্ঞানী-গুণী, বিদ্যানুরাগীদের মিলনস্থান এবং সাহিত্য চর্চার পাদপীঠ হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত একটি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে থেকে নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ড. হাবিবুর রহমান বলেন: "তিনি শুধু বড় কবিই নন; আমি তো বলবো বিশ্বসাহিত্যের দশজন নয় বরং দুই-তিন জন মহৎ কবির মধ্যে তিনি অন্যতম প্রধান কবি-পুরুষ। রবীন্দ্র-কবিতার কাছে প্রজ্ঞা ও নন্দন-তৃষ্ণার্ত মানুষকে চিরকালই ফিরে আসতে হবে।" [৬০]

৫৯। ইসমত মাহদী, Modern Arabic Literature, (হায়দ্রাবাদঃ রাব্বি পাবলিশার্স, ১৯৮৩ খ্রি.) পৃ. ৫০-৫১

৬০। ড. রহমান হাবিব, রবীন্দ্রকাব্যদর্শন (ঢাকা: সূচিপত্র, ২০০৬), পৃ. ৮

তৃতীয় অধ্যায়

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথকে সামাজিক কবি হিসেবে মূল্যায়ন

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ উভয় সামাজিক কবি হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তাঁদের কবিতায় সমাজ চিন্তাকে বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে উভয়ের কাব্যিক ছন্দে। চলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও মানবিক চাহিদা নিয়ে তারা রচনা করেছেন বিভিন্ন কবিতা। সমাজের অগ্রগতি, উন্নয়ন ও সংস্কারে তাদের কবিতা অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে। শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ তাদের কবিতার মাধ্যমে সকলকে সমাজ সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তারা উভয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাদের কবিতার উপজীব্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেন। তারা নানা প্রকার কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ঔপনিবেশিক শাসকদের পরাধীনতা থেকে জাতিকে মুক্তির আহবান জানিয়েছেন বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে। তাদের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সংগ্রামী হয়ে ওঠে। তারা কবিতার মাধ্যমে দেশের মানুষদের আরো পরিশ্রমি ও আন্তরিকভাবে সকল ক্ষেত্রে কাজ করার আহবান জানান। সামাজিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন মদ্যপান, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নিয়ে তারা কবিতা রচনা করেছেন। নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তাদের উভয়ের কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ সমাজ-চিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। তারা কবিতার মাধ্যমে একটি আলোকিত সমাজ গড়ার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এটি স্পষ্ট বলা যায় যে, একটি ঘুমন্ত সমাজকে জাগ্রত করতে এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে আলোক আভায় উদ্ভাসিত করতে তাদের কবিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে সামাজিক কবিতায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এসব কারণে আহমাদ শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সামাজিক কবি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

১ম পরিচ্ছেদ

সমাজের সাধারণ মানুষদের কবি হিসেবে আহমাদ শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ

ক) শাওকী সমাজের সাধারণ মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কবিতা লিখেছেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে বঞ্চিত মিশরবাসীর আশা আকাঙ্খা ও অন্তরের কথা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি মিশরবাসীর একজন মুখপাত্রের ন্যায় সে সমাজের মানুষদের চেতনা ও অনুভূতি জাগ্রত করেছেন। শাওকীর সমাজ সংস্কারমূলক কবিতা সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। সমাজে বসবাসরত একজন মানুষের পুরো সমাজ নিয়ে ভাবনার পরিধি, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে তিনি সচেতন করে তোলেন। শাওকীর এরকম সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে সে সমাজের মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করেন। তাকে কবিকুলের শিরমনি 'أمير الشعراء' বা 'কবিকুলের সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১ম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্বদেশে ফিরে মিশরীয় সমাজের বঞ্চিতদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন আহমাদ শাওকী। পরাধীন একটি জাতিকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে জাগিয়ে তোলেন তিনি। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মিশরবাসীকে জাগ্রতকরণেও তাঁর কবিতার ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। মিশরকে আবাদি করার উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে কষ্ট ও শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা উর্পাজনের আহবান জানিয়ে রচনা করেন 'أيها العمال ' নামক কবিতাটি।

কবি বলেন:

أيها العمال أفنوا العمر كدا واكتسابا
و أعمروا الأرض' فلولا سعيكم أمست يبابا
أيها العمال'

অনুবাদ:

> "হে কর্মপরায়ণ কর্মীরা! তোমরা পরিশ্রম ও (হালাল) উপার্জন করে জীবন অতিবাহিত কর।
> (মিসরের) ভূমিকে আবাদ কর। তোমরা (মিসর উন্নয়নের) প্রচেষ্টায় অবহেলা করলে (মিসর) শস্য শ্যামল শূন্য হয়ে যাবে।"

কবি আরো বলেন:

إن للقوم لعينا ليس تألوك ارتقابا
أيها العمال [৬১]

৬১। আহমাদ শাওকী, আশ শাওকিয়াত (মিসর: মু'য়াচ্ছাসাতুল হিনদাবি লিলতালিম ওয়া আস্ সাকাফাত, ২০১২ খ্রি.) ১ম খণ্ড, পৃ ১২৫

অনুবাদঃ সে সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অভিশাপ যাদের প্রত্যাশা নেই।

তাঁর কবিতায় অনুপ্রেরণা পেয়ে মিশরবাসী তথা পুরো আরব সমাজ অধিকার আদায়ে সংগ্রামী হয়ে ওঠে। তাদের কেড়ে নেওয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শাওকী এ ধরনের কবিতার মাধ্যমে নিজেকে একজন স্বাধীনতাকামী সমাজ সচেতন কবি হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন।

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজে বসবাসরত মানুষদের নিয়ে সর্বদা চিন্তা করতেন এবং তাদের ভাবনা ও উপলব্দিকে উপজীব্য করে কবিতা রচনা করতেন। এ ধারার কবিতাগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহুল আলোচিত 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'সোনার তরী' কবিতাটি অন্যতম। এ কবিতায় কবি সমাজ সংসারের একটি বাস্তব ও আধ্যাত্মিক বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। কবির ভাষ্যমতে, সমাজ সংসার অস্থায়ী। মানুষ এ সমাজ সংসারের সুখের কথা ভেবে অবিরাম কষ্ট ও পরিশ্রম করে যাচ্ছে। অথচ সমাজ সংসারের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সমাজ সংসার মানুষের কর্মকে গ্রহণ করে ও মনে রাখে। কিন্তু মানুষকে সে কখনই গ্রহণ করে না, মনেও রাখে না। কালের পরিক্রমায় সে মানুষটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। কবি এ সমাজ সংসারের বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্দি করেছেন। কবির উপলব্দি, মানুষ এ সমাজ সংসারের একেকজন কৃষক। একজন কৃষক যেমন কঠোর পরিশ্রম ও অবিরাম কষ্ট করে মাঠে ফসল ফলায়। সে ফসল অন্যের ভোগের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সে ভোক্তা হয়ে ফসল থেকে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে ভক্ষণ করেন। সে সময় ভোক্তা তার উৎপাদনের পেছনে যে একজন পরিশ্রমী ব্যক্তি আছেন, তা মোটেও মনে রাখে না। এ সমাজ সংসারও ঠিক এ কৃষকের ন্যায়। কবির এ চিন্তাধারায় প্রমাণিত হয় যে, এ সমাজ সংসারে বাস্তবিকই মানুষ বড় একা। এ সমাজ ব্যবস্থাপনা মানুষের কৃতিত্বের কথাই মনে রাখে। অথচ এ কৃতিত্বের স্রষ্টাকে মনে রাখে না। 'সোনার তরী' বিষয়বস্তু থেকে সম্পূর্ন বিপরীত মাত্রায় তিনি রচনা করেন 'আকাশের চাঁদ' নামক একটি চেতনাজাত কবিতা। এ কবিতায় কবি সমাজ সংসারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সকলকে এ সমাজ সংসারের ভালোবাসা উপেক্ষা না করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। জগৎ সংসার পরিহার করে নয়; এ সমাজ সংসারে থেকেই পরকাল

অর্জনের আহবান জানান কবি। বৈরাগ্যবাদ বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে রচনা করেন 'মায়াবাদ' কবিতা। এ ধারার আরো কবিতা হলো 'মানস-সুন্দরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। এসব কবিতায় সমাজ নিয়ে কবির দর্শন ও উপলব্দি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৬২] কবি বলেন:

"নিঃশ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি,
কহে ম্রিয়মাণ মন,
'শশী নাই চাই যদি ফিরে পাই
আরবার এ জীবন।"

-আকাশের চাঁদ। [৬৩]

এ সমাজ-সংসারকে পরিহার ও অবজ্ঞা করে অলীক প্রাপ্তির পেছনে যারা দৌড়ায় তাদের জীবনে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম বলে অভিহিত করছেন উপরোক্ত লাইনগুলোতে। এ বিষয়ক আরো লিখা পাওয়া যায় কবির 'মায়াবাদ' কবিতায়।

"লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা,
তুমি জানিতেছ মনে, সব ছেলেখেলা।"

-মায়াবাদ। [৬৪]

কবি তাঁর 'মায়াবাদ' কবিতার মাধ্যমে সমাজ-সংসার থেকে বিমুখ হওয়ার বিষয়ে মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কবি সংসার ত্যাগীদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে রচনা করেন 'বৈরাগ্য' নামক কবিতাটি। এখানে কবি বলেন:

"কহিল গভীর রাত্রে সংসার বিরাগী,
গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?
দেবতা কবিলা, 'আমি।' শুনিল না কানে।
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!"

বৈরাগ্য। [৬৫]

জগৎ সংসারে থেকেই স্রষ্টাকে পাওয়া যায়। এর জন্য সংসার ত্যাগী হয়ে অন্যত্র যেয়ে উপাসনার জন্য একাকিত্ব জীবন যাপন কবির নিকট অপছন্দনীয়। কবির ভাষ্যমতে, এ সমাজ জীবনেই স্রষ্টাকে পাওয়া যায় মানবতার সেবা করে। সমাজ-সংসার বড়ই সুন্দর ও

৬২। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ৫০-৫১
৬৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, জুন ১৯৯৫), পৃ. ৩২
৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
৬৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা (ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৫৯

মায়াময়। সুতরাং একে উপেক্ষা বা অবহেলা করার কোন সুযোগই বৈরাগ্যবাদীদের নেই। তাই এ সমাজ সংসার ত্যাগীদের এ ধরনের চিন্তা থেকে ফিরে আসার আহবান জানান কবি। ভারত উপমহাদেশে বর্ণ বৈষম্য প্রবর্তক ছিলেন ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ। সমাজের এ বর্ণবাদ বা জাতিভেদ প্রতিরোধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার ও প্রতিবাদী ছিলেন। সমাজের অত্যাচার নির্যাতনের চিত্র কবিতায় উল্লেখ করে সমাজের বসবাসরত মানুষদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানান তিনি। 'এবার ফিরাও মোরে' এ ধারার একটি অনন্য কবিতা। মানবতার কল্যাণার্থে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে কবি নিজেকে একজন নির্ভিক ও সাহসী প্রমাণ করেছেন। [৬৬] কবি বলেন:

" কবি, তবে উঠে এসো– যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যাথা- সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।"

-এবার ফিরাও মোরে [৬৭]

বাস্তবসমাজ চিত্রের মনোভাবাপন্ন কবিতা রবীন্দ্রনথের প্রায় সকল কাব্যগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। কবি বিশ্বাস করতেন জীবন-সার্থকতার জন্য শুধু ভাব বা কল্পনা করলে হবে না, প্রয়োজন বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হওয়া। সংসারের সকল মানুষের সাথে একত্রিত হয়ে বসবাসের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। জাতি-ধর্ম, বর্ণ ও বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের দুঃখে ব্যথিত হওয়া এবং পাশে থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার মানসিকতা পোষণের বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চিত্রা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ সমাজের অবহেলিত মানুষদের কথা ভেবেছেন। যারা সমাজের শত দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনা সহজে মেনে নিয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সমাজের কাজ করে যাচ্ছে। তাদের বর্ণনা দিয়ে তিনি রচনা করেন 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি। সমাজের নিগৃহিতদের কথা এভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ফুটিয়ে তোলার কারণে তাকে একজন প্রকৃত সমাজ ভাবুক হিসেবে প্রতিয়মান হয়।

৬৬। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ৭৬
৬৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী (ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪

কর্মচারী ও মালিকের মধ্যকার সম্পর্কের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'পুরাতন ভৃত্য' নামক কবিতাটি। এ কবিতার মাধ্যমে কবি মালিক-কর্মচারী মধ্যকার বৈষম্যমুক্ত আচরণের বিষয় সমাজের মানুষদের সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন।

কবি বলেন:

"ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর–
যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে–
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে– "

.....

"যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য।"

.....

"এত দিন শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধ'রে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।
মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত,
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, 'কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন।"

-পুরাতন ভৃত্য [৬৮]

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সর্বদা সাধারণ মানুষদের পক্ষে ছিল। সমাজ বিরোধি কোন কর্মকাণ্ডই তিনি সমর্থন করতেন না। বিশেষ করে জমিদারি বিষয়ক ধ্যান ধারণা রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ ছিল। তবে জমিদারি প্রতিরোধ করলে সমাজের মহাজনদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ও রবীন্দ্রনাথকে বেশ ভাবিয়ে তোলত। তাই তিনি জনগনের কথা ভেবে জমিদারি প্রথা চালু রাখেন। দারিদ্র্যতা ও রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তোলত। তিনি মনে করতেন, দারিদ্র্যতা সমাজকে কলুষিত করে ও পিছিয়ে দেয়। তিনি সমাজ থেকে দারিদ্র্যতা হ্রাসে মানব উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধক দারিদ্র্যতা। তিনি মনের করেন, এর জন্য সর্ব প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। ভালো মানুষদের ক্ষমতায়ণ করতে হবে। সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে তাঁর মতে সমাজ পরিবর্তিত হবে। রবীন্দ্রনাথের এ অসাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা তাঁর মৃত্যুর ৫০ বছর পর নোবেল বিজয়ী ও একজন শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মুখে শুনা যায়।

৬৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১৩৬।

২য় পরিচ্ছেদ

সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ

ক) আহমাদ শাওকী ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে মিশরীয়দের সামাজিকভাবে সুসংহত করার চেষ্টা করেন। তিনি সে সমাজের লোকগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আহবান জানান। তিনি পুরো আরব বিশ্বকে একটি মানবদেহের অস্তিত্বের সাথে তুলনা করেন। তিনি মনে করেন, পুরো আরব বিশ্ব একে অপরের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা অনুভব করবে এবং তা সমাধানের চেষ্টা করবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আরব সমাজের রাজনৈতিক দলগুলোর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি আরব বিশ্বের সকলকে পারস্পরিক সহযোগিতার এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে شهيد الحق নামক হৃদয়স্পর্শী কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন:

"الا الخلف بينكم؟ إلاما؟ و هذه الضجة الكبرى علاما؟
و فيه يكيد بعضكم لبعض و تبدون العداوة و الخصاما؟

****

و لينا الأمر حزبا بعد حزب فلم نك مصلحين و لا كراما
جعلنا الحكم تولية و عزلا و لم نعد الجزاء و الانتقاما
و سسنا الأمر حين خلا إلينا بأهواء النفوس فما استقاما

****

شهيد الحق' قم تره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى

****

بك الوطنية اعتدلت و كانت حديثا من خرافة أو مناما
شهيد الحق [৬৯]

অনুবাদ:

> হায়! নিজেদের মধ্যে এ বিরোধ! কি জন্য এ মহাবিবাদ?
> কিসের আশায় একে অপরের ষড়যন্ত্র করছে এবং প্রকাশ করছে শত্রুতা ও বিরোধিতা?
> দলের পর দল আমরা ক্ষমতায় এসেছি। কিন্তু আমরা (দেশ ও জনগণের জন্য) কোন উন্নয়ন ও উপকার করিনি।

৬৯। আহমাদ শাওকী, আশ-শাওকিয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৩০৫

শাসন বলতে আমরা বুঝি ক্ষমতায় বসা ও অপসারন। আমরা এখানে শুধু প্রতিদান ও প্রতিশোধ পাই।

যখন আমাদের কাছে কোন কাজ আসে, প্রবৃত্তির বশে তখন আমরা তাই করতে থাকি।

হে সত্যের শহীদ! জেগে ওঠো এবং এই ভূখণ্ডের সে সকল অনাথদের দেখ, যারা (যুগের পরিক্রমায়) হারিয়ে গেছে।

তুমি দেশীয় সঠিক নির্দেশনা পেয়েছো; অথচ একসময়ে এটা ছিল এক অলীক গল্প কিংবা স্বপ্ন।

শাওকী বিশ্বাস করতেন একটি সুস্থ ও সুন্দর জাতি বিনিমার্ণে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সবাইকে পারস্পরিক বিরোধিতা ও কলহ পরিহার করা। সমাজের একে অন্যের প্রতি সহনশীল ও আন্তরিক হলে তবেই একটি সুস্থ্য সমাজ তৈরি হবে। আর সুস্থ্য সমাজের সৃষ্টি হলেই একটি সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এভাবে শাওকী মিশরের সমাজে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুস্থ্য রাজনীতি চর্চার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কবিতা রচনা করে তাদের সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তিনি ভারতের কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে কবিতা রচনা করে নিজেকে একজন বিশ্বকবি হিসেবে প্রমাণ করেন।

খ) সৃষ্টি জগতের অপূর্ব সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা কবি রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্দি করেন। এ জগতের উদ্ভিদ, জীব ও জড়ের মধ্যকার ঐক্যবদ্ধতা কবিকে বিমোহিত করে। কবির আশা জগতের এ ঐক্য ও শৃঙ্খলা আমাদের সমাজ জীবনেও প্রতিষ্ঠিত হোক। কবির এ ভাবনা সমাজে সুসংহত করার আহবান জানিয়ে রচনা করেন 'সোনার তরী', 'বসুন্ধরা' ও 'চিত্রা' নামক কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতা। কবির বিশ্বাস, এ শৃঙ্খলাবোধ সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করলে মানুষ জীবনকে সত্য ও সুন্দর পথে পরিচালিত করতে পারবে। কবির এ প্রকৃতি ভাবনা সমাজ জীবনে সুশৃংখলা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। [৭০]

কবি বলেন:

"দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জরে, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ।" বসুন্ধরা। [৭১]

৭০। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ৫২-৫৩

৭১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ৯৩

এ কবিতার মাধ্যমে কবি জীব ও উদ্ভিদ জগতকে একই সুতোয় বেঁধেছেন এবং এ জগৎ-সংসারের মনোরম সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার বিষয় আলোকপাত করেছেন। জগত সংসারকে বিচিত্র রঙে রঙ্গিন বলে কবি 'চিত্রা' নামক কবিতায় বলেন-

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী। - চিত্রা

.....
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।"

-চিত্রা। [৭২]

ভারতের স্বাধীকার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল সংগ্রামমুখর। তিনি কবিতার মাধ্যমে ভারতীয় জনগণকে ধৈর্য ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি সৎ, দক্ষ ও নৈতিকতা সম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। অধিকার আদায়ে কিভাবে জাতিকে সুসংহত থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হয় সে বিষয় দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় কবির 'গুরু গোবিন্দ' কবিতায়। এসবই প্রমাণ করে তিনি একজন সমাজ সচেতন কবি ছিলেন। [৭৩]

তিনি বলেন:

"কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব–
পেয়েছি আমার শেষ!

.....
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।"

-গুরু গোবিন্দ। [৭৪]

কবিতার লাইনগুলোতে কবি প্রত্যেককে আত্মত্যাগী, অধ্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান হওয়ার আহবান জানান।

৭২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ : ১২৭
৭৩। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য, পৃ.: ৪১
৭৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ: ৮৬

৩য় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও ধর্মীয় চিন্তায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ

ক) শাওকী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে কবিতা রচনা করেন। তিনি সমাজের শিক্ষা উন্নয়ন নিয়ে ভাবতেন। একটি উন্নত সমাজ বিনির্মাণে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর প্রথম দিকের অধিকাংশ কবিতা ছিল শিক্ষা বিষয়ক। তিনি মিসরীয় তরুণ ও ছাত্র সমাজকে নিয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক ও শিক্ষামূলক কবিতা রচনা করতেন। তাঁর রচিত এ ধরনের একটি কবিতা হলো ' العلم' و التعليم' و واجب المعلم '। তিনি বলেন:

قم للمعلم وفه التبجيلا　　كاد المعلم أن يكون رسولا
أعلمت أشرف أو أجل من الذي　　بيني و ينشئ أنفسا و عقولا؟
سبحانك اللهم خير معلم　　علمت بالقلم القرون الأولى
العلم' و التعليم' و واجب المعلم[৭৫]

অনুবাদ: "শিক্ষকের সম্মুখে দাঁড়াও এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। কারণ একজন শিক্ষক একজন রসূলের সমান।

আমাদের মধ্যে শিক্ষকের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান আর কেউ কি আছে? একজন শিক্ষক মানুষের জ্ঞান ও মন তৈরি করেন।

হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (তুমিই) শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তুমি সৃষ্টির সূচনা থেকে মানুষদের কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছো।"

এ কবিতায় তিনি জ্ঞানার্জন, শিক্ষাদান ও শিক্ষকদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সমাজের মানুষদের সজাগ ও সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাগুরু হলেন শিক্ষক। সুতরাং শিক্ষার এ মহান বাহকদের সমাজের সকলকে সম্মান করতে হবে।

শাওকী বিশ্বাস করতেন একটি নৈতিকতা সম্পন্ন ও মূল্যবোধের সমাজ গঠনে ধর্মীয় অনুশীলন আবশ্যক। সেজন্য তিনি ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করে সমাজের মানুষগুলোকে ধর্মীয় বিষয় সচেতন ও ধর্মীয় নির্দেশনা অনুসরণে উৎসাহিত করেন।

৭৫। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত (১ম খণ্ড), পৃ. ২৪৫

তিনি ইসলামী বিষয়ে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। বিশেষ করে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবন ও কর্ম বিষয়ক সিরাত ও প্রশংসা সম্বলিত দীর্ঘ কবিতা 'الهمزية النبوية' 'আল হামযিয়্যাতুন নাবাবিয়্যাহ' রচনা করেন। কবি বলেন:

ولد الهدى فالكائنات ضياء و فم الزمان تبسم و ثناء
الروح والملأ الملائك حوله للدين و الدنيا به بشراء
و العرش يزهو' و الحظيرة نزدهى و المنتهى' و السدرة العصماء

حديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان' شذية' غناء
و الوحى يقطر سلسلا من سلسل و اللوح و القلم البديع رواء

[৭৬] الهمزية النبوية'

অনুবাদ: পথ প্রদর্শক (মুহাম্মদ স.) জন্ম গ্রহণ করেছে। ফলে বিশ্ব আলোকিত হয়েছে। এবং যুগের মুখে প্রশংসার হাসি ফুটেছে।

তাঁর চারপাশে জীবরাঈল আমীন (আ.) ও ফিরেশতাদের বিশাল দল নিয়োজিত আছে। তারা তাঁর দ্বীন ও দুনিয়ার সুসংবাদদাতা।

(মুহাম্মদ (স.) এর আগমনে) আল্লাহর আরশ সুসজ্জিত করা হয়েছে। তার আশপাশের সংরক্ষিত প্রাঙ্গণ গৌরবান্বিত এবং তথাকার কুলবৃক্ষ উজ্জ্বল।

আল-কুরআনের বাগিচায় সমুজ্জ্বল টিলার সৃষ্টি হয়েছে। বাগিচাটি সুরভিত এবং (পাখিরদের কিচিরমিচির শব্দে যেন) সঙ্গীতমুখর।

পর্যায়ক্রমে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। আর অপূর্ব লেখনী লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে।

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা নিয়ে ভাবা শুরু করেন তাঁর ৩১ বছর বয়স থেকেই। শিক্ষাবিদদের মতে তাঁর শিক্ষা ভাবনা ছিল 'নান্দনিক, মানবিক ও আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভ'। তিনি পুথিঁগত শিক্ষার পরিবর্তে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের বিষয়ে জোর তাগিদ দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমেরিটাস অধ্যাপক মরহুম আনিসুজ্জামান বলেন: 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনা তাঁর সময়ের চেয়ে অগ্রসর ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির,

৭৬। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত (১ম খণ্ড), পৃ. ৪১

ভাবনার সঙ্গে কর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে মনুষ্যত্ববোধের, স্থানিকতার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার, আহরণের সঙ্গে প্রকাশের, আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা লাভের যে চিন্তা তিনি করেছিলেন, তা আজও প্রশংসিত।' [৭৭] ১৮৬৩ খ্রি. কলকাতায় বোলপুর স্টেশনের নিকট রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থাপন করেন শান্তিনিকেতন আশ্রম। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে 'ব্রক্ষবিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯২১ সালে ওই জায়গায় তিনি 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করেন। 'বিশ্বভারতী' ১৯৫১ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। [৭৮] ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে সুরুল গ্রামে কুঠিবাড়িটি ক্রয় করে সেখানে 'বিশ্বভারতীর' দ্বিতীয় শিক্ষাপ্রাঙ্গন হিসেবে স্থাপন করেন "শ্রীনিকেতন"। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে "পল্লীসংগঠন কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করেন। দরিদ্রদের শিক্ষার সুযোগদানে ১৯৩৬ সালে সেখানে স্থাপন করেন "লোক-শিক্ষা সংসদ"। ১৯৩৭ সালে "শিক্ষাচর্চা" নামে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন। [৭৯] শিক্ষা বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো: 'সুখ', 'ঝুলন', ' এবার ফিরাও মোরে', এবং 'সমুদ্রের প্রতি' ইত্যাদি। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়; বরং প্রকৃতি থেকেও মানুষ শিক্ষালাভ করতে পারে। এরকমই বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' নামক কবিতায়।

কবি বলেন: হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শংকা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন। তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা। 'সমুদ্রের প্রতি' [৮০]

এ বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের প্রকৃত শিক্ষালাভের স্থান। মানুষ এ প্রকৃতি থেকেই ধীরে ধীরে শিখছে অজানা অনেক কিছু। আর প্রকৃতিও যেন মানুষদের শিখাতে কোন কার্পণ্য করে না। এ ধরনের বর্ণনা এসেছে কবির 'ঝুলন' নামক কবিতায়।

৭৭। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা' শীর্ষক সম্মেলন, ঢাকা, প্রথম আলো, প্রকাশকাল: ৬ আগস্ট ২০১৬ খ্রি.
৭৮। শান্তিনিকেতন, উইকিপিডিয়া
৭৯। শ্রীনিকেতন, উইকিপিডিয়া
৮০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ৪৩

কবি বলেন: ওগো, পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল!
দে দোল্ দোল।
পশ্চাৎ হতে হাহা ক'রে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর অট্টরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল। 'ঝুলন' [৮১]

প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্য থেকে মানবতার যে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে তার বর্ণনা 'সুখ' নামক কবিতায় কবি উল্লেখ করেছেন।

কবি বলেন: আজি মেঘমুক্ত দিন; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো; সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর।
'সুখ' [৮২]

রবীন্দ্রনাথ একজন শিক্ষা সংগঠক ছিলেন। তিনি মনে করেন, শিক্ষা হচ্ছে চিন্তা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ। শিক্ষা যেন পাঠ্যবই নির্ভর না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন বই বেশি বেশি পড়ার প্রতি জোর তাকিদ দেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন, পুথিঁগত বিদ্যা প্রকৃত শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা তাই, যা মানুষ নিজের চিন্তা-চেতনা শক্তি থেকে শিখে। তিনি শিক্ষা লাভের জন্য প্রকৃতির ছায়া ঘেরা পরিবেশে মনের বিকাশের উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির আহবান জানান।[৮৩] এভাবে এ মহান শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সংস্কার, বিস্তার ও উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন।

ধর্ম মানুষকে সত্য ও সুন্দর পথে ধাবিত করে। ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়। সামাজিকভাবে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ধর্মোন্মত্ততা ও পরধর্মে নিন্দা এ দুটি ব্যধি সমাজকে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবিত করে বলে তিনি মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একজন আস্তিক্যবাদী এবং পারিবারিকভাবে হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ধর্মীয় উন্মাদনা প্রতিরোধে ও পরধর্মের প্রতি উদারতা প্রকাশের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি লিখেছেন 'ধর্ম প্রচার' শীর্ষিক কবিতাটি। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ধর্মাজ্ঞ ও ধর্মান্ধদের

৮১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৮২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১২৪
৮৩। ইবনে গোলাম সামাদ, 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন', নয়া দিগন্ত, প্রকাশকাল: ০৯ জুন ২০১৮ খ্রি.

উপহাস করেছেন। তিনি মানব কল্যাণ ও মানব উন্নয়নে এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার সুফল বয়ে আনতে ধর্মচর্চার আবশ্যকতার বিষয়ও এ কবিতায় আলোকপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এভাবে বাঙালি সমাজকে পশ্চাৎপদতা থেকে বের করে ধর্মীয় সকল অনুশীলন যথাযথ পালন করার আহবান জানিয়ে একটি সুশৃঙ্খল ও সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ধমান্ধদের অন্ধ ধর্মপ্রীতিকে উপহাস করে রচনা করেন 'ধর্মপ্রচার নামক কবিতাটি। কবি বলেন:

"তরে-রে! লাগাও লাঠি
কোমরে কাপড় আঁটি।
হিন্দুধর্ম হউক রক্ষা
খৃস্টানি হোক মাটি!" -ধর্মপ্রচার। [৮৪]

কবি সে সময়কার ধর্মান্ধ কতিপয় হিন্দু ধর্মাবলম্বিদের পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণের কথা উল্লেখ করেন এ লাইনগুলোতে। কবি পরধর্মের প্রতি এ ধরনের আচরণকে ধিক্কার জানিয়েছেন। পরধর্মের প্রতি কবির সহিষ্ণু আচরণের উল্লেখ পাওয়া যায় কবির 'ধর্মপ্রচার' কবিতায়। কবি বলেন:

"যদি চাস তুই ইষ্ট
বল্ মুখে বল্ কৃষ্ট।
ধন্য হউক তোমার নাম,
দয়াময় যিশুখৃস্ট।" -ধর্মপ্রচার। [৮৫]

পরিবার ও সমাজ ত্যাগ করে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণে তিনি নিরুৎসাহিত করেন 'ধর্মপ্রচার' কবিতায়। কবি বলেন:

"হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।
সুখ, সভ্যতা, রমণীর প্রেম,
বন্ধুর কোলাকুলি
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি!" -ধর্মপ্রচার। [৮৬]

৮৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৯৮
৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

এ জগৎ সংসারের শেষ হলো মৃত্যু। আর মৃত্যুর চিন্তা দার্শনিক যুক্তিতে উপস্থাপন করে তিনি রচনা করেন মৃত্যু-চিন্তা বিষয়ক কবিতা 'প্রতীক্ষা'। এ ধারার আরো দুটি কবিতা হলো 'ঝুলন' ও '১৪০০ সাল' নামক কবিতা।[৮৭] কবি বলেন:

"হয়তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর-দূরান্তরে
অজ্ঞাত ভুবন-' পরে
কভু কোনোখানে
আর কি গো দেখা হবে,
আর কি সে কথা কবে,
কেউ নাহি জানে।"

-মৃত্যুর পরে।[৮৮]

কবি মৃত ব্যক্তির শোকে শোকাহত এবং বেদনাহত হয়ে উপরোক্ত কবিতার লাইনগুলো রচনা করেন। কবি মনে করেন একজন ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর জগৎ সংসারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই কবি মৃত্যুর ভয়ে শিহরিত হয়ে রচনা করেন 'মৃত্যু' নামক কবিতাটি। কবির ভাষায়:

"মৃত্যু অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।
সংসার বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে"

-মৃত্যু।[৮৯]

কবি জগৎ সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া ব্যক্তির শোকে মুহ্যমান হয়ে রচনা করেন "দুঃসময়" নামক কবিতা। কবির ভাষায়-

"যেথা একদিন ছিল তোর গেহ
ভিখারির মতো আসে সেথা কেহ!
কার লাগি জাগে উপবাসি স্নেহ
ব্যাকুল মুখে!"

– দুঃসময়।[৯০]

৮৭। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য, পৃ. ৮১
৮৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১২৯
৮৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
৯০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০

৪র্থ পরিচ্ছেদ

নারী ভাবনায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ

ক) শাওকী সে সমাজের নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কবিতা রচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি নারী অগ্রগতি ও উন্নয়নে বিশ্বাসী। তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কেননা তিনি মনে করতেন, একটি জাতির উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। সমাজে নারীরা উপেক্ষিত বা অবহেলিত থাকলে চলবে না। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও শিক্ষা ও কর্মে যোগ্য ও দক্ষ হতে হবে। তিনি নারীদের বিয়েতে মতের স্বাধীনতা প্রদান করেন। জোর জবরদস্তি করে নারীদের পাত্রস্থ করা শাওকী মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি এসব কথা তাঁর কবিতায় সুচারুভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। কবি বলেন- وجد المساعد غيركم و حرمتم فى مصر عون الأمهات جليلا

و إذا النساء نشأن فى أمية رضع الرجال جهالة و خمولا

العلم' و التعليم' و واجب المعلم '[৯১]

অনুবাদ: "তোমাদের ছাড়াই সহযোগিতা পাওয়া গেছে। তবে তোমরা মিসরে মাতৃকূলকে (সুশিক্ষিত করার) সহযোগিতা থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত করেছো। যদি নারীরা নিরক্ষরতা নিয়ে বড় হয় তখন পুরুষরাও অজ্ঞতা ও মূর্খতার মাঝে লালিত পালিত হয়।" এ প্রসঙ্গে কবি আরো বলেন:

مصر تجد مجدها بنسائها المتجددات

النافرات من الجمود كأن شبح الممات

مصر تجد نفسها بنسائها المتجددات[৯২]

অনুবাদ: "সংস্কারপন্থী নারীরাই মিসরের মর্যাদা ও সম্মান ফিরিয়ে আনবে।

মৃত্যাকৃতি স্থবিরতা থেকে তারা মুক্ত।"

তিনি নারীর সম্মান, শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণে যথার্থ ভূমিকা রাখেন। দেশ ও জাতির উন্নয়নে নারী জাতির সুরক্ষা ও অধিকার সুনিশ্চিত করণের প্রয়োজনীতা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেন।

৯১। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত (১ম খণ্ড), পৃ. ২৪৭।

৯২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২ ।

খ) একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর অধিকার নিয়ে ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাল্যবিবাহ একটি চরম সামাজিক অন্যায় কাজ। রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'নব বঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় সামাজিকভাবে প্রচলিত এ ব্যধির কুফল উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি অনেক সমাজ সচেতন ও দায়িত্ববান কবি। রবীন্দ্রনাথ সমাজের এভাবে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করে একটি আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৭২ থেকে ১৯৪১ খ্রি. পর্যন্ত বাংলায় নারীর অনুপাত কমে যাওয়ায় সমাজবিদরা বাল্যবিবাহ ও অপুষ্টিকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পরিলক্ষিত হয়েছে। কবিতায় পল্লী সমাজে বসবাসকারী একটি মেয়ে শহুরে জীবনে কতটা প্রানহীন তার বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' নামক কবিতায়।

কবির ভাষায়: "সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট–
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।
কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁগো!
উঠিলে নবশশী ছাদের 'পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো?
হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি, মা, আঁখিজলে রজনী জাগো'
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো" বধূ।[৯৩]

অবুঝ মেয়েটিকে তার পরিবার শহরের এক ছেলের সাথে বিয়ে দেয়। এতো অল্প বয়সের মেয়ে শহরের কিছুই বুঝে না। এ জীবনের মায়া-মমতার স্বল্পতা সে উপলব্দি করেছে। তার কাছে এ শহরটা চার দেয়ালে বন্দি জীবন মনে হয়েছে। এখানে গ্রামের মতো প্রশস্ত জায়গা, মাঠ, খাল-বিল ও মেঠো পথ নেই। তাই এ জীবনটা তার কাছে একেবারেই প্রাণহীন। স্বল্প বয়সের বিবাহিতা মেয়েটি চিনেনি স্বামী কি? আর বুঝেনি সংসার কি? অনুভব করেনি দাম্পত্য জীবন। সে শুধু মায়ের ও গ্রামের স্মৃতি স্মরণে বিভোর। বাল্যবিবাহের

৯৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৫৭

পরিনতি যে কত ভয়াবহ তাই কবি সকলকে এ কবিতার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বাল্য বিবাহের কুফল ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা বধূর মানসিক অবস্থার চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন 'বালিকা বধূ' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

"ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই-যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা-
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধূ।"

-বালিকা বধূ। [৯৪]

অপ্রাপ্ত বয়স্কা বুদ্ধিহীন বালিকা মেয়েটি বিয়ের মর্ম বুঝেনি। অবুঝ মেয়েটি বুঝেনি স্বামী কি? স্বামীর প্রতি তার দায়িত্ব কি? সে তার স্বামীকে তার খেলার সাথী মনে করছে। এসবই কবি উপরোক্ত কবিতার লাইনগুলোতে উপস্থাপন করেছেন। এ ধরনের বিবাহের মাধ্যমে নারীর প্রতি এক ধরনের অন্যায় আচরণ করা হয়। এতে প্রমাণিত যে, বাল্যবিবাহ একটি জঘণ্য সামাজিক অপরাধ। কবির প্রত্যাশা, এসব অপরাধ থেকে সমাজ আগামী দিনে বেঁচে থাকবে।

নারী অধিকার আদায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। তিনি সমাজের নারীহৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশে জোর দিয়েছেন। সংসার বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকায় সমাজ জীবনে সংসার নিয়ে চলছে প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদ ও সংসার বিচ্ছেদ। রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে এ বিষয়ক যথাযথ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। রূপহীন নারীরা সমাজ জীবনে পরিবারের নিকট উপেক্ষিত। তাদেরকে সমাজের বোঝা মনে করা হয়। তারাও নিজেদেরকে সর্বদা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং শঙ্কিত জীবনযাপন করেন। কবি নারী হৃদয়ের এ বাস্তব চিত্র 'ব্যক্ত প্রেম' নামক কবিতায় উপস্থাপন করেন। সংসার জীবনে নারীরা নিজের প্রতি অনাদর, উপেক্ষা ও অবহেলা মানতে পারলেও প্রেমের উপেক্ষা ও অবহেলা কখনো মানতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংসারের নারীর মনের কথা এভাবে উপস্থাপন করেছেন 'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি'

৯৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ২৭৯

নামক কবিতায়। সমাজে নারীরা বসবাস করবে বৈষম্যমুক্ত ভাবে। তিনি মমতাময়ী নারীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এভাবে যে, নারীরা সবার খাওয়া শেষে যদি কিছু থাকে তা-ই খায়। এ সত্যটি কবি গভীরভাবে উপলব্দি করেছেন। সমাজ জীবনে নারী কল্যাণময়ী। সমাজ উন্নয়নে তাদের ভূমিকার কথা বর্ণনা দিয়ে রচনা করেন 'রাত্রে ও প্রভাতে' নামক কবিতা। এ কবিতায় কবি নারীকে সমাজের দেবী হিসেবে সম্বোধন করেন। কবি 'চিত্রা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় নারীকে মাতৃতুল্য ও কল্যাণময়ী হিসেবে উপস্থাপন করেন। কবি বলেন:

"রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে–
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়িয়ে দূরে অবনতশিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদী তীরে।"

-রাত্রে ও প্রভাতে। [৯৫]

রবীন্দ্রনাথ নারী হৃদয়ের সুন্দর মানসিকতার বিষয় ব্যক্ত করে রচনা করেন 'নারী উক্তি' কবিতাটি। কবি বলেন:

তুমিই তো দেখালে আমায়

প্রেম দেয় কতখানি– কোন্ হাসি, কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালোবাসা।
তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা–
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে চলে যাওয়া, এই কাছে আসা। -নারীর উক্তি। [৯৬]

সমাজে চলতে হলে পারস্পরিক মমতা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন। তা অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি সামাজিক এ সম্পর্ককে কবিতায় শাশ্বত ও সার্বজনীন বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের অন্যতম রচনা হলো 'প্রেমের অভিষেক' ও 'সান্ত্বনা' নামক কবিতা। কবির ধারনা একজন নারীই সামাজিক এ বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৯৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৪৫

রাখতে পারে। কবির বিশ্বাস, মমতাময়ী নারীর সংস্পর্শে সমাজের রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। একটি অশান্ত সমাজ শান্ত হতে পারে। এ ধরনের অনুভূতির কথা কবি চিত্রিত করে রচনা করেছেন 'ভরা ভাদরে' ও 'প্রত্যাখ্যান কবিতা'। কবি সমাজে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার চিরন্তন অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে রচনা করেন 'লজ্জা' নামক কবিতাটি। 'মার্জনা' কবিতায় কবি আবেগধর্মী ভালোবাসার একটি চমৎকার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। 'স্পর্ধা' বাঙালি মমতাময়ী নারীর হৃদয়ের গভীর অনুভূতির একটি অপূর্ব কবিতা। 'সে আমার জননী রে' কবিতায় মাতৃ স্নেহের শাশ্বত রূপটি ব্যক্ত করছেন। নারীর হৃদয়ের সমৃদ্ধ ভালোবাসার প্রতি কবি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে রচনা করেন 'মার্জনা' নামক আবেকধর্মী কবিতাটি। কবির ভাষায়:

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালোবাসিতে
তবু ভালোবাসা কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি-কণা হাসিতে
এই অসহায়াস্রপানে চেয়ো না, বন্ধু, চেয়ো না।"

-মার্জনা। [৯৭]

তিনি নারী হৃদয়ের প্রেমানুভূতির কথা ব্যক্ত করে রচনা করেন 'স্পর্ধা' নামক কবিতাটি। কবি বলেন:

"আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে
সখী, ওলো সখী, ভাবিতেছে আঁখিনীরে–
কেন সে এল না ফিরে!"

-স্পর্ধা। [৯৮]

৯৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্পনা, পৃ. ১৯।
৯৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

চর্তুথ অধ্যায়

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সামাজিক দিকসমূহ

আহমাদ শাওকী বিভিন্ন কবিতায় মিশরের সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মিশরীয় সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী ও শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় শাওকীর বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন অসংগতি, অমিল, বিবাদ, অন্যায় অপরাধ ও বৈষম্যের কথা তিনি কবিতায় এনেছেন। তিনি সমাজ উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেছেন। কেননা তিনি মনে করেন ধর্ম মানুষদের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়। সুতরাং ধর্মের সঠিক চর্চা সমাজের বিভিন্ন অমিল ও অসংগতি ঠিক করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করছেন। সমাজ উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের কথা ওঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। তিনি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা উন্নয়ন নিশ্চিত করার আহবান জানিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। গ্রামীণ উন্নয়ন তাঁর কবিতার অন্যতম সামাজিক দিক। তিনি মনে করতেন গ্রামের উন্নয়ন হলে সমাজ উন্নত হবে। আর উন্নত সমাজ হলেই উন্নত রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষে সর্বস্তরে অর্থনৈতিক সাফল্য আনয়নে কৃষি কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। আর কৃষিকাজ উন্নয়নে অবশ্যই কৃষকদের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তিনি পল্লী সমাজে বঞ্চিত ও অবহেলিত কৃষক শ্রেণির উন্নয়নে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন। যেমন: ঋণে জর্জরিত কৃষকদের বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণমুক্তকরণ, মহাজনদের নির্যাতন ও অপমান থেকে কৃষকদের রক্ষা করা, কৃষকদের কৃষি কাজে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান, দেশে কৃষি কাজ সম্প্রসারণে সমবায় ভিত্তিক 'কালিগ্রাম' নামক কৃষিব্যাংক স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ সমাজ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এতে সুস্পষ্ট যে, ভারতবর্ষে কৃষি উন্নয়নে কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধান স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এ ধরনের বিস্ময়কর চিন্তা চেতনা সত্যিই সকলকে আবিভূত করে। গ্রামে গ্রামে তিনি কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে অনুপ্রাণিত করেন। ফলে চাষীরা উন্নত চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ট্রাক্টর ব্যবহার করতে শুরু করে। [৯৯] রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ সামাজিকতা এবং নারী নির্যাতনের

৯৯। আহমদ রফিক, বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ, (ঢাকা: কাকলি প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.) পৃ. ৭১-৭৫

বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বক্তব্য তুলে ধরছেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় অনুশাসন যথাযথভাবে পালনের কথা তিনি বিভিন্ন কবিতায় উল্লেখ করেন। এতে প্রমাণিত, আহমাদ শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রতিনিয়ত চিন্তা করতেন এবং তাদের কবিতায় তা প্রধান উপজীব্য করে কবিতা রচনা করে সমাজের মানুষদের সচেতন করার চেষ্টা করতেন। এ কারনেই উভয় কবির কবিতায় সামাজিক দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করা অতীব প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

১ম পরিচ্ছেদ

নারী অধিকার নিশ্চিতকরণে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

আহমাদ শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের কবিতার মাধ্যমে নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক অনেক সামাজিক কবিতা রচনা করেছেন। সমাজের নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারীদের পক্ষে সর্বপ্রথম কাব্যিক ছন্দে মিসরে আহমাদ শাওকী ও ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ক) ১। নারীদের ঘরের বাহিরে যাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকরণ: মিসরীয় সমাজের কিছু ব্যক্তিবর্গ নারীদের চার দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ করে রাখতো। তারা নারীদের ঘর থেকে বের হতে দিতো না। নারীদের বাজারে যাওয়া, চাকুরি করা ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল মিসরীয় সমাজে। সে সমাজের সমাজপতিরা নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণে অস্বীকৃতি জানাতো। তারা মনে করতো, নারীরা ঘরের বাইরে যাওয়া চরম অন্যায় ও অপরাধ। এ মহান সংস্কারবাদী কবি মিসরীয় সমাজের কু-সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি নারী ও পুরুষের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কবিতা রচনা করেন। শাওকী এসব সংগ্রামী কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন যে, নারীরা পর্দা করে পুরুষের ন্যায় সমাজের সকল কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। নারীরা পর্দা রক্ষা করে এবং নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বাজারে যাওয়া ও চাকরি করার বৈধতা প্রদান করেন শাওকী তাঁর অসংখ্য কবিতায়। এ বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো ‘ كوك صو و المرأة العثمانية ’। এ সব কবিতার মাধ্যমে কবি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, নারীরা তাকওয়ার পোশাক পরিধান করে এবং পর্দার সাথে নিজেদের আবরুহ রক্ষা করে অনায়াসে বাজারে যেতে পারে। পর্দার পাশাপাশি নারীদের সৎচরিত্রবান হওয়ার বিষয় তিনি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন كوك صو নামক কবিতায়। এ কবিতায় তিনি পর্দা কার্যকরকরণে নারীদের সৎচরিত্রের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

কবির ভাষ্য হলো:

فقل للجانحين إلى حجاب   أتحجب عن صنيع الله نفس؟

إذا لم يستر الأدب الغواني   فلا يغنى الحرير و لا الدمقس

[১০০] " كوك صو"

অনুবাদ:

" আপনি বলুন: পর্দা কি শুধু অপরাধীদের জন্যই। কেউ কি আল্লাহর সৃষ্টি এভাবে ডেকে রাখবে?

যদি (নারীর মধ্যে) শালীনতা না থাকে তবে রেশমী কাপড় পরিধানে কোনো কাজে আসবে না।"

কবি এখানে নারীদের পর্দার চেয়ে সৎচরিত্রের বিষয় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, নারীর মধ্যে যখন পর্দা থাকবে তখন সে নারী যে অবস্থায় থাকুক না কেন নিজেকে নিরাপত্তার মধ্যে রাখতে পারবে। অনেক নারী পর্দার সাথে চলাফেরা করেন অথচ চরিত্রবান নয়। তাহলে তার পর্দা শুধু লোক দেখানো। অতএব, যে নারী সৎচরিত্রবান হবে সে স্বাভাবিকভাবে পর্দাণশীন ও শালীনভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়।

নারী স্বাধীনতার বিষয় বেশ জোরালো মতামত উপস্থাপন করেছেন و بين الحجاب‌| بين الحجاب و السفور' ও المتجددات مصر تجد نفسها بنسائها নামক কবিতাদ্বয়ে। السفور' নামক কবিতায় কবি নারীদের চার দেয়ালের বন্দি দশা থেকে বের হয়ে বিশাল পৃথিবীকে প্রাণভরে দেখবার আহবান জানান। যেমনিভাবে খাঁচায় বন্দি পাখী মুক্ত আকাশে উড়াল দিতে খাঁচা থেকে বের হওয়ার প্রাণন্তর চেষ্টা করে তেমনি নারীদেরও নিজের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঘরে বসে না থেকে বের হওয়ায় আহবান জানান। কবির ভাষায়, নারীরা এভাবে ঘরে বসে থাকলে নিজেদের অজ্ঞতা ও মুর্খতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কবির এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, নারীরা পুরুষদের মতো কাজে সক্রিয় থাকলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন আরো গতিশীল হবে।

১০০। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত (২য় খণ্ড), পৃ. ৪৩৪।

কবির ভাষায়:

"اسمع' فرب مفصل لك لم يفدك كمجمل

صبرا لما تشقى به أو ما بدا لك فافعل

****

إن طرت عن كنفي وقعت على النسور الجهل

بين الحجاب و السفور[১০১]

অনুবাদ:

" শুন! কতেক বক্তা রয়েছেন যারা তোমাদের বিষয় অসম্পন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। (তোমাদের বিষয়) যা অভিযোগ করা হয় তাতে ধৈর্য্যধারণ কর। অথবা, যা তোমার জন্য আবশ্যকীয় মনে কর তা করতে থাকো।

যদি নিজেদের থেকে (এ বিষয়) কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে অজ্ঞতা ও মুর্খতার মধ্যে তোমরা পতিত হবে।

কবিতার লাইনগুলোতে কবি যারা নারীদের বিষয় অজ্ঞতাবশত বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন, তাদের ধিক্কার দেয়েছেন। তিনি নারীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণে ঘরের বন্দিদশা থেকে বের হয়ে নিজেদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজে নিয়োজিত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। কবির নারী বিষয়ক এ ধরনের প্রয়াস নিঃসন্দেহে সামাজিকভাবে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও জাগরণে মিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২। বিবাহে সম্মতি প্রদানে নারী অধিকার: জাহেলী যুগে নারীরা ছিল সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত। রাসূলুল্লাহ (স.) ঐশী বাণীর আলোকে নারীদের সকল অধিকার নিশ্চিত করেছেন। নারীদের দিয়েছেন বেঁচে থাকার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার এমনি বিবাহে সম্মতি প্রদানের অধিকার। আহমাদ শাওকীর সময়কালে নারীদের এসব অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়। তিনি এ বিষয়ে ছিলেন সোচ্চার ও প্রতিবাদী। তিনি কবিতার মাধ্যমে নারীদের এসব অধিকার ফিরিয়ে দিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। নারী জাতিকে যথাযথ মর্যাদা প্রদানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা

১০১। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত (১ম খণ্ড), পৃ. ২৪০।

রাখেন। একটি বৈষম্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। সেসময় নারীদের বিবাহে সম্মতি প্রদান এবং স্বামী গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এসব বঞ্চনা ও লাঞ্চনা নারীদের নিঃশেষ করে দিচ্ছিল মিসরীয় সমাজ ব্যবস্থায়। এতে নারীরা বাক স্বাধীনতা হারাতে বসলো। নারীদের সম্পত্তির লোভে পুরুষরা বহুবিবাহে আবদ্ধ হতে লাগলো। সঠিক সময়ে পুরুষদের সম্পত্তি দিতে না পারলে নারীদের ওপর নেমে আসতো অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন। এটি মিসরীয় সমাজে যৌতুক প্রথার মতো বিবেচিত। আহমাদ শাওকী মিসরীয় সমাজের এ সকল ধ্বংসাত্মক চিত্র তাঁর الست هدى নামক কাব্যনাট্যে ফুটিয়ে তোলেছেন। কবির ভাষায়:

إني لم أخطبك يا هدى لفرط حسنك
و لا تزوجتك يا صغيرتي لسنك
و لا وقعت في البلاء لسواد عينك

الست هدى [১০২]

অনুবাদ:

"হে কনে! আমি তোমার সৌন্দর্যের প্রতি অবিচারের বিষয় কিছু বলব না।
হে বালিকা! তোমার এ বয়সে কেউ তোমাকে বিবাহ করতে পারে না।
তোমার এ কালো রঙের সুন্দর চক্ষুকে কেউ বিপদে ফেলতে পারে না"

কবি এখানে নারীদের বিবাহে সম্মতি প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন। মিসরের পুরুষরা একাধিক বিবাহে আবদ্ধ হতো, এতে কবির কোন আপত্তি নেই। তবে কবির নিকট আশ্চর্যের বিষয় ছিল মিসরীয় সমাজের বাল্য বিবাহ। কবি বিশ্বাস করতে পারেন না অবুঝ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা একটি মেয়েকে একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারেন। পুরুষরা একচ্ছত্র ভাবে নারীদের ওপর জোর খাটাতো এবং অন্যায় আচরণ করতো। সৎচরিত্রবান ও পুত পবিত্র একজন নারীর জীবনকে এভাবে মিসরীয় সমাজ বিপর্যয়ে ফেলতো। এভাবে কবি মিসরীয় সমাজের নারীদের বিষয় গভীরভাবে ভাবতেন এবং তা কবিতায় চিত্রিত করে মিসরীয়দের সমাজ সচেতন করার চেষ্টা করতেন।

১০২। আহমাদ শাওকী, আস সিত্তু হুদা (মিসর: মুয়াস্সিসাতু হিনদাবি লিল তা'লিম ওয়া আস সাকাফাত ২০১২ খ্রি.) পৃ. ৫২

কবি আরো বলেন:

ما اخترت يا عمتي و لكن أبی و أمي تخيرا لي!

بنات مصر يخطبن لكن لا يتناقشن فی الرجال!

نباع يا عمتي و نشری و ما نحن إلا عروض مال!

لست هدى ۱۰৩[১০৩]

অনুবাদ: "হে আমার ফুফু! আমি (বর) পছন্দ করিনি। আমার বাবা-মা উভয়ই আমার জন্য (বর) পছন্দ করেছেন।

মিসরী মেয়েরা পুরুষদের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হয়ে বিয়ের প্রস্তাব মেনে নেয়।

হে ফুফু! আমরা এভাবে (পুরুষদের কাছে) ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছি। আমরা তো (পুরুষদের নিকট) প্রদর্শনীর সামগ্রী মাত্র।"

আহমাদ শাওকী এভাবেই নারীদের অধিকার বঞ্চিত হওয়ার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এবং বাল্য বিবাহের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তোলেছেন। এর থেকে উত্তরণের জন্য নারীদের প্রতিবাদী হওয়ার আহবানও জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়।

৩। পারিবারিক জীবনে নারীর ভূমিকা: আহমাদ শাওকী মিসরীয় সমাজের নারীদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তিনি স্ত্রী, মা, বোন ও কন্যাদের প্রতি সুন্দর আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করে 'عبث المشيب' নামক কবিতা রচনা করেন। কবিতাটিতে কবি পারিবারিক জীবনে নারীর ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। একজন নারী পারিবারিক জীবনে সন্তান লালন পালন, স্বামীর খেদমত, ঘরের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি করে থাকেন। কবি বলেন:

ظلم الرجال نسائهم و تعسفوا هل للنساء بمصر من أنصار؟

*****

شاطرنهم نعم الصبا و سقينهم دهرا بكأس للسرور عقار

الوالدات بنيهم و بناتهم الخائطات العرض كالأسوار

الصابرات لضرة و مضرة المحييات الليل بالأذكار

[১০৪] عبث المشيب

১০৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১০৪। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত (১ম খণ্ড), পৃ. ১৭৫।

অনুবাদঃ "স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের ওপর নির্যাতন করে এবং স্বেচ্ছাচারী আচরণ করছে। মিসরের নারীদের কোন সাহায্যকারী আছে?

অথচ এ নারীকূল শিশুকালে তাদের সযত্নে লালন পালন করেছে। যুগ যুগ ধরে (এ নারীকূল) সেরা সম্পদ হিসেবে তাদের স্বামী ও সন্তানদের আগলিয়ে রেখেছে।

মায়েরা তাদের (স্বামীদের) সন্তান-সন্ততিদের উত্তমভাবে বড় করেছে। (স্বামী ও সন্তানদের প্রতি) মায়েদের আচরণ আলোকোজ্জ্বল ভোরের ন্যায় স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ।

ধৈয্যধারণকারী মায়েরা যেকোন বিপদে-আপদে স্বামী/সন্তান অসুস্থ হলে আল্লাহর স্বরণে রাত কাটায়।"

কবির ভাষ্যমতে, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে আমাদের নারীদের ভূমিকা অনন্য। সন্তান জন্ম দেয়া, লালন-পালন, সেবা-যত্ন ইত্যাদি কাজ নারীরা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পালন করেন। পরিবারের বিপদ-আপদে সংসারকে আগলিয়ে রাখে এ নারী সমাজ। পরিবার ও সমাজের জন্য যাদের এতো অবদান তাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন দুঃখজনক। তাই, কবি উপরোক্ত লাইনগুলোতে যেসকল মানুষ নারীদের প্রতি নির্যাতন করে তাদের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন।

৪। নারী শিক্ষা বিস্তরণে গুরুত্বারোপঃ আহমাদ শাওকী নারী বিষয়ক বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর পূর্বে ও পরে নারী বিষয়ক এতো কবিতা কেই রচনা করেনি। শাওকীর কবিতা সংকলন الشوقيات এর অধিকাংশ কবিতায় নারী সংক্রান্ত বিষয় স্থান পেয়েছে। সমাজে নারী শিক্ষা বিষয়ে সর্ব প্রথম কথা বলেছেন আহমাদ শাওকী। তিনি নারীদের পুরুষদের ন্যায় সমান শিক্ষা অধিকারের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে পুরুষদের যেভাবে শিক্ষালাভের অধিকার আছে নারীদেরও অনুরূপ অধিকার রয়েছে। সেসময় নারীদের শিক্ষালাভের সুযোগটুকু দ্বীনী শিক্ষালাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শাওকী বুঝতে পেরেছেন নারীকূল অশিক্ষিত ও মুর্খ থাকলে দেশ পিছিয়ে যাবে। দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তাই তিনি পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রকৌশলবিদ্যা লাভে গুরুত্বারাপ করেছেন। শাওকী উপলব্দি করেছেন যে, আরব বিশ্ব পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হলো নারীর মূর্খতা। তিনি বিশ্বাস করেন একজন নারী একটি

জাতির ভবিষ্যৎ। যদি নারী মূর্খ হয় তবে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মূর্খ হবে। নারীকূল অশিক্ষিত ও মূর্খ থাকা মানে পুরো জাতি মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা। কাজেই নারীদের শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিতকরণে শাওকী গুরুত্বরাপ করেন। আহমাদ শাওকী العلم و التعليم و واجب المعلم নামক কবিতায় নারীদের অজ্ঞতা ও মুর্খতা, পুরুষদের অজ্ঞতা ও মুর্খতা এবং দেশ পিছিয়ে যাওয়া অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন:

وجد المساعد غيركم و حرمتم

في مصر عون الأمهات جليلا

و إذا النساء نشأن فى أمية

رضع الرجال جهالة و خمولا

العلم و التعليم و واجب المعلم [১০৫]

অনুবাদ: তোমাদের ছাড়াই সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

তবে মিসরে মাতৃকূলকে (সুশিক্ষিত করার) সহযোগিতা থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বস্তুত: যখন নারীরা অজ্ঞতা নিয়ে বেড়ে ওঠবে

তখন অন্ধকার ও অজ্ঞতা নিয়েই পুরুষ জাতি বেড়ে ওঠবে।

কবির মতে, নারীরা মায়ের জাতি। তারা যদি শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হয় তবে জাতির কপালে দুঃখ রয়েছে। কারণ, যে জাতির মায়েরা অশিক্ষিত সে জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও অর্থনৈতিক সাফল্য থেকে চরমভাবে পিছিয়ে পড়বে। সুতরাং মায়েদের শিক্ষিত করা খুবই প্রয়োজন।

৫। সমাজ উন্নয়নে নারীর ভূমিকা: আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় মুসলিম সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং মিসরীয় সমাজের নারীদের সমাজ উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি তাঁর مصر تجدد نفسها بنسائها المجددات নামক কবিতায় ইসলামী যুগে মুসলিম নারীদের প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলেছেন।

১০৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

কবি বলেন:

العلم كان شريعة لنسائه المتفقهات

رضن التجارة و السياسة' و الشؤون الأخريات

******

و حضارة الإسلام تنطق عن مكان المسلمات

بغداد دار العالمات' و منزل المتأدبات

مصر تجدد نفسها بنسائها المجددات [১০৬]

অনুবাদ: বুঝশক্তি সম্পন্ন নারীদের জন্য জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক ছিল।

ব্যবসা, রাজনীতি ও (সমাজের) অন্যান্য বিষয়ে অংশগ্রহণে নারীদের সম্মতি প্রদানের সুযোগ থাকতো।

ইসলামী সভ্যতা মুসলমান নারীদের অবদান বিষয়ে কথা বলে,

বাগদাদ হলো (মুসলিম) নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের গৃহ।"

কবি শিক্ষালাভের পাশাপাশি নারীদের ব্যবসা, রাজনীতি ও সমাজ পরিচালনা অধিকার যে ইসলাম দিয়েছে তা উপরোক্ত কবিতার লাইনগুলোতে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং নারীদের ইসলামের কথা বলে ঘরে বন্দি রাখার সুযোগ নেই। নারীদের সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে।

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমনি নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন নির্ভিক তেমনি সমাজ থেকে বাল্য-বিবাহ ও যৌতুক প্রথা রোধে ছিলেন সোচ্চার ও প্রতিবাদী। রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন নারী এ সমাজের অবিচ্ছেদ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজ ও দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীদের এ অধিকার নিশ্চিতকরণে সমাজের মানুষদের সচেতন করেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। নারী হৃদয়ের প্রেমানুভূমির বর্ণনাও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

১। নারী হৃদয়ের গভীর প্রেমানুভূতির বর্ণনা: আমাদের সমাজে লাবন্যহীন নারীদের প্রতি প্রতিনিয়ত উপেক্ষা ও অবহেলা করা হয়। এ ধরনের নারীদের সমাজের বোঝা মনে করা হয়।

১০৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২, ১৪৩

তারা বেঁচে থাকার সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত। পিতা ও স্বামীর সংসারে তারা অনাদর, বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার। এ ধরনের নারীরা নিজেদের সর্বদা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তারা শঙ্কিত ও আতংকিত জীবন যাপন করে। তাদের জীবনটাই বিনোদনহীন। রবীন্দ্রনাথ এসব অবহেলিত নারীদের মনের আবেগ ও অনুভূতির কথা তাঁর 'ব্যক্ত প্রেম' নামক কবিতায় উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের সমাজ সংসারের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং সমাজের রূপহীন নারীদের বিষয় সকলকে সচেতন করার চেষ্টা করেন।

কবি বলেন:

"আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি-
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।"

কবি আরো বলেন:

"লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত!
আঁধারে হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো
ভাঙিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়!
লাজে-ভয়ে থরথর ভালোবাসা-সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িয়ে নিদয়"

- ব্যক্ত প্রেম [১০৭]

নারী প্রকৃতগতভাবে ভালোবাসার কাঙাল। সংসার জীবনে নারীরা নিজের প্রতি অনাদর, অবহেলা ও উপেক্ষা সহ্য করতে পারলেও ভালোবাসার উপেক্ষা ও অবহেলা কখনোই সে সহ্য করতে পারে না। নারী রূপহীন হতে পারে তাই বলে তার মধ্যে মায়া-মমতা ও প্রেম-ভালোবাসার কোনো ঘাটতি নেই। প্রেম-ভালোবাসা এটি মমতাময়ী নারীদের বিশেষ গুণ। সে যখন সংসার জীবনে প্রবেশ করে তখন জীবনের অনেক আশা ও প্রত্যাশা থেকে বঞ্চিত থাকতে আপত্তি নেই। কিন্তু, প্রেম-ভালোবাসার মায়া থেকে সে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে রাজি নয়। কবি সমাজের উপেক্ষিত নারীর মনের কথা এ ভাবেই ব্যক্ত করেন তাঁর কাব্যিক রসে।

১০৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৫৮

কবি বলেন:

"কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ!
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?"

ব্যক্ত প্রেম [১০৮]

কবি ভাষায়:

"নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে" ব্যক্ত প্রেম [১০৯]

কবি এখানে সংসার জীবনে এসে নারীরা স্বামীর প্রেমের যে ঘাটতি উপলব্দি করেন তারই বর্ণনা দিয়েছেন। স্বামীর ঘরে প্রেমের অভাবের কথা এভাবে ব্যক্ত করছেন কবি:

এ কী নিদারুন ভুল, নিখিল নিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে কেন এলে
অভাগিনী রমনীর গোপন হৃদয়ে! -ব্যক্ত প্রেম [১১০]

নারীর প্রতি যদি ভালোবাসা ও প্রেম না থাকে তবে কেন তাকে সংসার জীবনে এনে প্রেমের ছলনা দিচ্ছ। নারী হৃদয়ের এ গভীর অনুভূতির কথা কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'ব্যক্ত প্রেম' কবিতার বিভিন্ন লাইনগুলোতে। রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংসার জীবনের নানা অভিযোগ বিষয়ক চমৎকার উপস্থাপনা করেছেন 'নারী উক্তি' নামক কবিতায়। এ কবিতায় কবি সমাজ সংসারের নারী-পুরুষের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের নানা অভিযোগ-অনুরাগ, বিবাদ-বিভাজনের চিত্র চমৎকার দার্শনিক যুক্তিতে কাব্যিক সুরে উপস্থাপন করেছেন। কবির ভাষ্যমতে, নারী মানে মায়াবী ও মমতাময়ী। সমাজ সংসারে তার বড় উৎসাহ হলো পুরুষ। সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে পুরুষকে ভালবাসে। সুতরাং পুরুষের নিকটও সে একনিষ্ঠ ও খাঁটি ভালোবাসা পেতে চায়। পুরুষের ভালবাসায় কোনরূপ ঘাটতি হলে সে অনায়াসে উপলব্দি করে। এতে সে নারীর মন ব্যথিত হয়। নারী সংসার জীবনের সকল অবহেলা মানতে পারে তবে ভালোবাসার অভাব কখনোই মানতে চায় না। রবীন্দ্রনাথ সমাজের এ বাস্তব চিত্র এ কবিতায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

১০৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
১১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

নারী সমাজ সংসারের অবহেলা সহ্য করতে না পেরে চোখের পানিতে বুক ভাসায়। সকল দুঃখ-কষ্ট নীরবে হজম করে। তবুও তার কারো প্রতি কোন অভিযোগ নেই। একজন অবহেলিত নারী চোখের পানিতে নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করলেও স্বামীর প্রতি তার কোন ধিক্কার বা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন না। এমনটিই দেখা যায়, তাঁর 'নারীর উক্তি' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

"মিছে তর্ক- থাক্ তবে থাক্,
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধু চোখের জল, এ নহে র্ভৎসনা" নারীর উক্তি [১১১]

মায়া মমতা থেকে বঞ্চিত একজন নারীর মানসিক অবস্থার কথাও ব্যক্ত করছেন 'নারীর উক্তি' কবিতার নিম্নোক্ত লাইনগুলোতে। কবি বলেন:

আছি যেন সোনায় খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয়– প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান। নারীর উক্তি [১১২]

মায়াহীন সংসার জীবন নারীদের কাছে বন্দি মনে হয়। নারীর কাছে মায়া-মমতা যেন একটি জীবনী শক্তি। একজন পুরুষের মায়া-মমতা ও ভালোবাসা একজন নারী অতি সহজে পরিমাপ করতে পারে। গতানুগতিক ভালোবাসার প্রকাশ ভঙ্গিকে নারীরা নিজের জন্য অপমান বলে অভিহিত করেন। নারীর প্রতি এ কৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শনকে অবজ্ঞা করে কবি বলেন:

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালোবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কী কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ-
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই-তিন।

-নারীর উক্তি [১১৩]

১১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

এসব পুরুষ প্রেমিকদের ধিক্কার দিয়ে কবি বলেন:

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে?

-নারীর উক্তি [১১৪]

নারী তার সর্বোচ্চ প্রেম নিবেদন করে একজন পুরুষকে ভালোবেসে সংসার শুরু করে। অথচ পুরুষ নারীর প্রেমের যথার্থতা বুঝেনা। ফলে সে নিজেকে নারীর জন্য সঠিকভাবে প্রেম নিবেদন করতে পারে না। তাই সে নারীর সমাজ সংসার সুখের পরিবর্তে এখন দুঃখে দিন কাটছে। সংসার জীবনে একজন নারীর প্রত্যাশা হলো পুরুষের শুধু একটু হাসি মাখা মুখ। অথচ পুরুষদের চিন্তা হলো সম্পূর্ন ভিন্ন। পুরুষ নিজেকে প্রেমের বন্দিতে আটকিয়ে রাখতে চায় না। বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ স্বভাবগত বাস্তববাদী অন্যদিকে নারী স্বভাবজাতভাবে আবেগময়ী। পুরুষ সংসার জীবনে স্ত্রীকে একজন সাধারণ নারী হিসেবে দেখে। ফলে তার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ একজন নারীর মতো এতোটা আবেগময়ী হয় না। পুরুষদের সংসার জীবনের এ ধরনের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন কবি তাঁর 'পুরুষের উক্তি' কবিতায় বলেন।

যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবন পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!
তখন উষার আধো আলো
পড়েছিল মুখে দুজনার।
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার!

-পুরুষের উক্তি [১১৫]

১১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

কবি আরো বলেন:

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নৈরাশ্যযাতনা!
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা। পুরুষের উক্তি [১১৬]

অনেক স্বপ্ন নিয়ে সংসার জীবন শুরু করে নারী ও পুরুষ। একে অপরের জীবনসঙ্গী হয়ে বেঁচে থাকার প্রত্যয় নিয়ে শুরু করে তাদের দাম্পত্য জীবন। তারা সংসার জীবনে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়। সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে যারা টিকে থাকতে পারে তারাই সমাজে সফল দম্পতি। কবির ভাষ্যমতে, বিবাদ-বিচ্ছেদ সমাজ সংসারে কাম্য নয়। সমাজের নারী-পুরুষ মিলেমিশে সুখী জীবন যাপন করবে এটাই কবির প্রত্যাশা। তার মতে, সংসার জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বন্ধু। স্বামী তার স্ত্রীকে সধর্মিণী হিসেবে আজীবন মেনে নিবে। তবেই সংসারে সুখ ও শান্তি নেমে আসবে। তাইতো কবি বলেন:

নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর!
কী পারিবি দিতে!
আছে কি অন্তম প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?

-নিষ্ফল কামনা [১১৭]

উপরোক্ত কবিতায় কবি পুরুষদের প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার আহবান জানান। কবির ভাষ্যমতে, ভালোবাসা আবেগের নয়। ভালোবাসা হলো বাস্তবতা। ভালোবাসার জন্য প্রকৃত মন থাকতে হয়।

১১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

কবি আরো বলেন:

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে
অতি সংগোপনে,
সুখে-দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি– নিষ্ফল কামনা [১১৮]

সংসার জীবনে নারী শুধু গৃহিনী বা ভোগের পাত্র নয়। নারী হলো জীবনের এক অমুল্য সম্পদ। এ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন করা প্রতিটি পুরুষের দায়িত্ব। তবেই একটি সুখী ও শান্তিময় সংসার জীবন গড়ে তোলা সম্ভব। এ সমাজ সংসার ক্ষণস্থায়ী হলেও ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী। কবি আশা করেন, সমাজের প্রতিটি পুরুষ ও নারী পারস্পরিক খাঁটি ও নিরেট ভালোবাসার সুদৃঢ় স্তম্ভ নির্মাণ করবে তাহলেই তারা সুখী দম্পত্তি হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে সক্ষম হবে। এ ধরণের প্রত্যাশা কবির 'ভরা ভাদরে', 'প্রত্যাখ্যান' ও 'লজ্জা' নামক কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। কবি বলেন:

"আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো।
কদম্ব গাছের সার
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো
কারি বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো।" ভরা ভাদরে। [১১৯]

কবি তাঁর প্রেমিকের সার্বিক বর্ণনা দিয়ে তাঁর প্রতি কবির নিষ্কলুষ ভালোবাসার প্রকাশ করছেন উপরোক্ত লাইনগুলোতে। সমাজ সংসারে সুখী হতে হলে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হতে হবে। এমন ভালোবাসাই পারে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করতে।

১১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ৭৩

কবি তাঁর "লজ্জা" নামক কবিতায় বলেন:

"আমার হৃদয় প্রাণ সকলেই করেছি দান,
কেবল শরমখানি রেখেছি
চাহিয়া নিজের পাশে নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি
হে বঁধূ; এ স্বচ্ছ বাস।"

লজ্জা। [১২০]

কবি আরো বলেন:

আমিও যে কতনিশি কেঁদেছি;
বুঝাতে পারিনে যেন সবদিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি।

লজ্জা। [১২১]

নারীর প্রতি যাদের ভালোবাসা বাহ্যিক, তাদের প্রতি ধিক্কার দিয়ে 'লজ্জা' নামক কবিতায় বিবৃত করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের সমাজ সংসারে প্রতিনিয়ত স্ত্রীরা স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। অথচ স্ত্রীরা তা নিশ্চুপ থেকে সহ্য করে যায়। স্বামীর শত নির্যাতন আর অবহেলা সত্ত্বেও একজন স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি ন্যূনতম ভক্তি ও ভালোবাসার কমতি করে না। স্বামীরা স্ত্রীদেরকে যতই উপেক্ষা ও অবহেলা করুক না কেন, স্ত্রীরা কিন্তু ততই স্বামীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করছে। নারীকুলের প্রেমের এ শাশ্বত রূপটি কবিতার মাধ্যমে কবি চিত্রিত করেছেন তাঁর "প্রত্যাখ্যান" নামক কবিতায়। কবি বলেন:

মনের কথা রেখেছি মনে যতনে।
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই রতনে।
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়- দুচারি-ফোঁটা- অশ্রু-ময়
একটি শুধু শোনিতরাঙা বেদনা।
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।।
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ, নাহিকো মোর রাণীর সাজ-
পরিয়া আছি জীর্ণচীর বাসনা।
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।।

-প্রত্যাখ্যান। [১২২]

১২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
১২১। প্রাগুক্ত ,পৃ. ৭৬
১২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে, এ প্রবাদটি বাঙ্গালী সমাজে বহুল প্রচলিত। সুতরাং সুখময় সংসারের পূর্বশর্ত নারীর প্রতি সহনশীল আচরণ। অথচ আজ আমাদের সমাজ তার সম্পূর্ণ উল্টো। একজন নারীকে স্বামী যেভাবে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে, নারী তা প্রতিবাদ না করে সহনশীলতার পরিচয় দিচ্ছে। নারীর উদারতা আর মায়া-মমতার এমনই চিত্র অংকন করেছেন কবি তাঁর 'প্রত্যাখ্যান' কবিতার লাইনগুলোতে।

যৌতুকের দায়ে কত নারী যে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে তার কোনো হিসেবে নেই। গরীব ঘরের মেয়ে বলে বিয়ে দিতে বাবাকে মোটা অংকের টাকা মেয়ের স্বামীর বাড়ীর লোকদের দিতে হয়। যৌতুকের দায়ে অগণিত নারীজাতি প্রতিনিয়ত স্বামীর নির্যাতন ও অপমান ভোগ করছে। তারপরও মমতাময়ী নারী স্বামীর নির্যাতনকে স্বর্গীয় সুখ মনে করে প্রতিনিয়ত তা সহ্য করে যাচ্ছে। কবি আশা করছেন, নারীর প্রতি ভালোবাসা হবে নিষ্কলুষ ও নিরেট। নারীর দেহ বা অর্থকে নয়, বরং নারীর মন ও হৃদয়কে জয় করতে পারলেই একটি সুখী পরিবার গঠিত হবে। আর কয়েকটি সুখী পরিবার নিয়ে একটি সুখী ও সমৃদ্ধির সমাজ গড়ে ওঠবে। নারীরা যদি সহনশীল না হতো তাহলে প্রতিনিয়ত কত সংসার যে ভেঙে যেতো তার কোন হিসেব নেই। নারীরা প্রয়োজনে স্বামীর অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে নীরবে নিভৃতে কান্না করবে, তবুও স্বামীর প্রতি ন্যূনতম কোন অভিযোগ করবে না; বরং স্বামীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা যথাযথভাবে করার চেষ্টা করবে। 'প্রত্যাখ্যান' নামক কবিতায় নারীর এমনসব চারিত্রিক বেশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন কবি।

কবির ভাষায়:

'ভেবেছি মনে, ঘরের কোণে রহিব।
গোপন দুখ আপন বুকে বহিব।
কিসের লাগি করিব আশা– বলিতে চাহি, নাহিকো ভাষা–
রয়েছে সাধ, না জানি তার সাধনা।
অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।

-প্রত্যাখ্যান। [১২৩]

নারী কষ্ট পেলে নিজে তা এককভাবে সহ্য করার চেষ্টা করে। নিজের ব্যক্তিগত কষ্টের জন্য অন্যকে কষ্ট দেওয়ার মানসিকতা নারী রাখে না। কষ্ট পেলে প্রয়োজনে ঘরের কোণে

১২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

বসে সে নীরবে কান্না করবে তবুও সে অন্যকে কষ্ট দিবে না এবং কষ্টের কথা বুঝতেও দিবে না।

২। নারীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদান: সমাজে নারীদের প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষার চিত্র প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়। সামাজিকভাবে নারীরা অনেকাংশে নির্যাতিত ও অপমানিত হয়। তাদের অমর্যাদা ও অসম্মান করা হয়। নারীদেরকে অনেকেই অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্যের প্রতীক মনে করে। রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের নারীদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, নারীরা সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি কবিতার মাধ্যমে সে সমাজের মানুষদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, নারী কোন সমাজের জন্য অকল্যাণকর ও অসম্মানের পাত্র নয়; বরং সম্মান, মর্যাদা ও কল্যাণের প্রতীক হলো নারী। রবীন্দ্রনাথ নারীদের মাতৃরূপে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছেন। তিনি নারীকূলকে দেবী বলে সম্বোধন করেছেন। নারী হলো পুরুষের অন্তরঙ্গ বন্ধু। পুরুষের জীবন সঙ্গিনী। একজন পুরুষের সুখ-দুঃখের সাথী। একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ বিনির্মাণে নারীর বিকল্প নেই। নারীই পারে এ সমাজের কাঠামোমূলে পরিবর্তন আনতে। সুতরাং সমাজ জীবনে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। কবি বলেন:

"রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।"

- রাতে ও প্রভাতে। [১২৪]

কবি অত্র লাইনগুলোতে নারীকে ভালোবাসার প্রতীক রূপে সম্বোধন করেছেন। নারীদের পুরুষদের প্রাণের ঈশ্বরতুল্য মনে করেছেন। আবার দেবী বলে সম্বোধন করেছেন।

কবি নারীর নরম হৃদয়ের মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অব্যক্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। নারীজাতি প্রেম প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ ও লালন করে; কিন্তু সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় যেমন: লজ্জা, ভয়-ভীতি, সমাজের অপমানের ভয়ে তারা তা ব্যক্ত করতে

১২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১৫৪

চায় না। রবীন্দ্রনাথ নারী হৃদয়ের লুকায়িত অব্যক্ত এ ভালোবাসার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, এ সমাজ ব্যবস্থা নারীর হৃদয় মনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। কবি নারী হৃদয়ের শাশ্বত রূপ চিত্রিত করেছেন তাঁর 'স্পর্ধা' নামক কবিতায়।

কবি বলেন:

"আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল–
কহিনু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল!'
সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়,
মিছে তারে অনুনয়।" -স্পর্ধা। [১২৫]

কবি এখানে নারী হৃদয়ের অব্যক্ত প্রেমের যাতনা ও কষ্টের কথা বর্ণনা করছেন।

নারীকূল কোমল হৃদয়ের অধিকারী। সমাজে তাদের এ প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। নারী তার প্রিয়তম স্বামীকে বেছে নেয়ার ও মতামত গ্রহণের কোন সুযোগ এ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নেই। নারীর মনের চাহিদা অনুযায়ী মনের মানুষ খুঁজে নেওয়ার কোন অধিকার এ সমাজ ব্যবস্থা রাখেনি। এ সমাজের প্রচলিত আইন হলো যার সাথে তার বিয়ে হবে তাকেই স্বামী হিসেবে আনুগত্য করতে হবে। নারীরা পারছে না মনের কথা শেয়ার করতে তার প্রিয়তম স্বামীর নিকট। কারণ স্বামী নিজেকে ভাবছে সে পুরুষ, সে ক্ষমতাবান। যেহেতু সমাজে নারীর মতামত প্রদানের কোন অধিকার নেই সুতরাং স্বামী হিসেবে তার কাছে মনের কথা বলারও কোন সুযোগ নেই। সমাজের মানুষদের নারীদের প্রতি এ ধরণের বৈষম্যমূলক আচরনের কথা কাব্যিকরূপ দিয়ে সমাজের মানুষদের নারীর মর্যাদা ও সম্মান বিষয়ক সচেতন করার চেষ্টা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রেমাকাঙ্ক্ষা শুধু পুরুষদের হৃদয়ে নয় নারীদের হৃদয়েও জাগ্রত হয়। প্রবল প্রেমে ভারাক্রান্ত নারী সমাজের প্রতিবন্ধকতার কারনে নিজের প্রিয়তমকে প্রেম নিবেদন করতে পারছে না। কথা বলতে পারছেনা। কয়েকবার প্রেমিকের সাথে সাক্ষাৎ হলেও নিজের প্রেমের কথা প্রকাশ করতে পারেনি। নারীর এ দ্বিধা-সংকোচ তার প্রেমিককে দূরে সরিয়ে দেয়। এসব প্রেমের ব্যর্থতার কথা ফুটে উঠেছে কবির 'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতাটিতে। কবিতায় কবি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার নারীর ব্যথিত হৃদয়ের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলেছেন।

১২৫। রবীন্দ্ররাথ ঠাকুর, কল্পনা, পৃ. ২১

কবি বলেন:

"তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়!'
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি-
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়
'নবীন পথিক, সে যে আমি, এই আমি!"

ভ্রষ্ট লগ্ন। [১২৬]

কবি ব্যথিত প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের চিত্র এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের আকাঙক্ষা থাকলেও কেন যেন এক অপ্রত্যাশিত উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় তা প্রকাশ করতে পারছে না।

কবি আরো বলেন: 'রয়েছি বিজন রাজপথ-পানে চাহি
বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি-
ত্রিযামী যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!' ভ্রষ্ট লগ্ন। [১২৭]

প্রেমিকা নারী প্রেমিক পুরুষের জন্য প্রেম নিবেদন করণার্থে অপেক্ষার প্রহর গুনছে। পরক্ষণে প্রেমিককে অতি কাছে পেয়েও নিজের ভালোবাসার কথা প্রিয়তম প্রেমিকের কাছে ব্যক্ত করতে পারেনি। ফলে প্রেমিক ভ্রারাকান্ত হৃদয়ে নিজেকে 'হতাশ পথিক' বলে মনে করেন। কবির ভাষ্যমতে, অনায়াসে প্রেম নিবেদনে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ সমাজ ব্যবস্থা। কারণ এ সমাজের মানুষ এভাবে প্রেম নিবেদনকে ভালো চোখে দেখবে না। ফলে লোক সমাজ প্রেম নিবেদনে কি বলবে বা কি মনে করবে এ কথা চিন্তা করে নিজের মনের কথা প্রকাশ করেনি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা যে আতংকে ও ভয়ে দিন কাটায় এটা তারই প্রমাণ। কবি নারী সমাজকে এ আতংক থেকে মুক্ত করে উচ্চাসনে আসীন করার চেষ্টা করেন।

৩। সমাজ সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকা: নারী এ জীবন সংসারের চির কল্যাণময়ী। সংসার জীবনকে সাবলীল ও সুন্দরভাবে পরিচালনায় একজন নারীর অবদান

১২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

অনস্বীকার্য। একজন নারী সমাজ সংসারে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পৃথিবীর যত কল্যাণকর ও শুভকর দিক রয়েছে তার পিছনে কোনো না কোন নারীর অবদান রয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন:

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'

নারী [১২৮]

আমাদের জগৎ সংসারে একজন নারী নানা দুঃখ-কষ্ট, যাতনা-গ্লানি এবং বিপদ-আপদ মোকাবেলায় সহনশীল ভূমিকা পালন করে। সংসারের সুখের জন্য নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে। চির সেবাময়ী নারীরা এ জগৎ সংসারকে টিকিয়ে রাখার বিষয়ে অবদান রেখে চলছে। এসবের বিষদ বর্ণনা দিয়ে নারীকূলের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'কল্যাণী' কবিতাখানি। এ কবিতায় কবি বলেন:

'সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দুটির মঙ্গলগীত
উঠে মধুর স্বরে।
সর্বশেষের গানটি তোমার
আছে তোমার তরে।।'

কল্যাণী [১২৯]

সমাজ সংসারে সুখী হওয়ার জন্য বিপুল পরিমান অর্থের প্রয়োজন নেই। কবির দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সু-সম্পর্ক একটি সুন্দর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন উপহার দিতে পারে। কবির এ আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের কথা 'পুরস্কার' নামক কবিতায় বর্ণনা দিয়েছেন। এ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ বাঙালির সমাজ জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূলতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বামী-স্ত্রীর চমৎকার কথোপকথনের চিত্র চিত্রিত করেছেন কাব্যিক ছন্দে। যা পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

১২৮। কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট ১৯২৫ খ্রি.) পৃ. ৬৪
১২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স), পৃ. ১০

কবির ভাষায়:

সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী,
'রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছে বসি পুঁথি বড়ো বড়ো
তার খোঁজ রাখ কি!
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব
মাথা ও মুন্ড, ছাই ও ভস্ম;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধরে এ কী ছেলেখেলা। পুরস্কার।[১৩০]

বর্ষার দিনে কবি বাড়ীতে বসে কবিতা লিখছিলেন। কবির স্ত্রী তাকে প্রেম নিবেদন করে এসব লিখালেখি বাদ দিয়ে সংসারের কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানান। তার চিন্তা হলো, এসব কবিতা হয়তো সুনাম ও সুখ্যাতি বয়ে আনবে কিন্তু সংসারের অর্থের যোগান এ দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা লিখার মাধ্যমে হবে না। কবির স্ত্রীর চিন্তা হলো, খাবার জন্য ভাত জুটে না অথচ কবিতার ছন্দ ঠিকই মিলছে। কবিকে তিনি এসব ছেড়ে সংসারমুখী হওয়ার আহবান জানান। স্বামী-স্ত্রীর সমাজ সংসারের এ চমৎকার বোঝাপড়া ও প্রেম-প্রীতির চিত্র কবিতার এ লাইনগুলোতে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির মতে, সুন্দর ও কল্যাণকর জীবন যাপনে মায়া-মমতা ও ভালোবাসার চর্চা করা প্রয়োজন। ভালোবাসা কবির জীবনকে পরিবর্তন করেছে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'প্রেমের অভিষেক' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

"তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট; পুষ্পভোরে
সাজায়েছ কণ্ঠে মোর। তব রাজটিকা" প্রেমের অভিষেক।[১৩১]

১৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ৭৮
১৩১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১২৫

প্রেম কবিকে মহিমান্বিত ও মর্যাদাবান করেছে। প্রেমের সুখানুভূতি কবিচিত্বে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এনেছে তারই বর্ণনা এসেছে কবিতার উক্ত লাইনগুলোতে। ভালোবাসা কবির মানসিক সংকীর্ণতা দূর করে উদারতা সৃষ্টি করেছে।

কবির ভাষায়:

" অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তারণে। হৃদিশয্যাতল" প্রেমের অভিষেক। [১৩২]

মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চিত্র উপরোক্ত লাইনগুলোতে পরিলক্ষিত হয়।

১৩২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

২য় পরিচ্ছেদ

সমাজ সংস্কারে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও অসংগতি সনাক্ত করে কাব্যিক ছন্দে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সমাজে শিক্ষা সংস্কার ও বিস্তরণ বিষয়ে তারা কবিতা লিখেছেন। বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, মাদক ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ বিষয়ক খারাপ দিকগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে সচেতনতামূলক লিখনী পাওয়া যায় তাদের কবিতায়।

শিক্ষা সংস্কার:

ক) শিক্ষা হলো একটি পরিবার, সমাজ ও দেশের মূল চালিকাশক্তি। একটি পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজে চালু করার মাধ্যমে একটি সুন্দর ও সুশিক্ষিত সমাজ গড়া সম্ভব। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের মানুষদের আচার-আচরণ, শিল্প-সংস্কৃতি, ভদ্রতা-নম্রতা ও নীতি-নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটায়। এসব বর্ণনা দিয়ে আহমাদ শাওকী রচনা করেন المدرسة নামক কবিতাটি। কবি এ কবিতায় উল্লেখ করেন, মানুষ গড়ার কারখানা হলো মাদ্রাসা বা বিদ্যালয়। মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে একজন মানুষ সুসভ্য ও ভদ্র হয়ে ওঠে। মানুষের আচরণিক পরিবর্তন ও উন্নত স্বভাব চরিত্র গঠনে মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় হলো অন্যতম মাধ্যম।

কবি বলেন:

أنا المدرسة اجعلنى كأم لا تمل عني
و لا تفزع كمأخوذ من البيت إلى السجن
كأني وجه صياد وأنت الطير في الغصن
و لا بد لك اليوم و إلا فغدا مني

المدرسة [১৩৩]

১৩৩। আহমাদ শাওকী, দিয়ানু আশ-শাওকিয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০৭।

অনুবাদ:

আমি মাদ্রাসা, আমাকে মায়ের মতো মনে কর। আমায় এড়িয়ে যেও না।
বাড়ি থেকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় আমাকে ভয় পাবে না।
আমি যেন শিকারি আর তুমি খাঁচায় বন্দি পাখি।
আজকের দিনটি অবশ্যই তোমার আর আগামীকালটি আমার।

এ কবিতার মাধ্যমে শাওকী মাদ্রাসাকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। মমতাময়ী মা যেমন করে একটি শিশুকে যত্নসহকারে ভালোবাসার মাধ্যমে লালন পালন করে বড় করে তোলে ঠিক তেমনি মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় একটি শিশুকে যত্নসহকারে ও মমতা দিয়ে আদব কায়দা শিখিয়ে বড় করে। সুতরাং মাদ্রাসা যাওয়াকে কখনই ভয় করা যাবে না। কবি শিশুদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন যে, মাদ্রাসা কোন ভয়-ভীতি কিংবা শংকার জায়গা নয়। মাদ্রাসা সকলের জন্য একটি নির্ভয় আশ্রয়স্থল। এখান থেকে জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যত সৃষ্টি হয়। কাজেই মাদ্রাসার প্রতি সকলের আস্থা অর্জন করতে হবে। এভাবে কবি মিসরীয় সমাজের মানুষদের মাদ্রাসায় ছেলে মেয়েদের ভর্তি করানোর বিষয়ে উৎসাহিত করেন। একটি অন্যায়-অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে মাদ্রাসার ভূমিকা অনন্য।

কবি আরো বলেন:

أنا المصباح للفكر أنا المفتاح للذهن
أنا الباب إلى المجد تعالى ادخل على اليمن
المدرسة [১৩৪]

অনুবাদ:

আমি চিন্তার আলোকবর্তিকা এবং মেধার উন্নয়নের চাবি
আমি মর্যাদার দ্বার। এসো এ উত্তম ঘরে প্রবেশ কর।

মাদ্রাসা বিরোধিদের প্রতি ধিক্কার দিয়ে কবি বলেন মাদ্রাসা হলো চিন্তার ক্ষেত্র ও মেধার উন্নয়ন এবং মননের বিকাশের চাবি। মাদ্রাসা হলো মানুষের সম্মান ও মর্যাদার প্রবেশদ্বার। সুতরাং সকলকে মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। মাদ্রাসাই মানুষদের সঠিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায়। প্রকৃত পক্ষে মাদ্রাসাই সমাজের মানুষদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১৩৪। প্রাগুক্ত. পৃ. ৯০৭ ।

কবি আরো বলেন:

ألقاك باخوان يدانونك فى السن
تناديهم بيا فكري و يا شوقي، و يا حسني
و آباء أحبوك و ما أنت لهم بابن

المدرسة [১৩৫]

অনুবাদ: "তোমাদের সমবয়সী ভাইদের সাথে তোমরা একসাথ হলে
হে আমার চিন্তা-চেতনা, আমার আবেগ ও সৌন্দর্য! তুমি তাদেরকে (বিদ্যালয়ে আসার জন্য) আহবান করো।
আর পিতাগণ (বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ) তোমাকে ভালোবাসে অথচ তুমি তাদের সন্তান না।"
কবি শিক্ষা অর্জনে এভাবে মিসরীয় সমাজের মানুষদের আহবান জানান।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অধিকাংশ মানুষ অর্জন করে মাতৃকোড়ে। সদা সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা, ওয়াদা রক্ষা করা, কারো ক্ষতি না করা, সদাচারণ করা, মানুষদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, নীতি-নৈতিকতাবোধ ইত্যাদি হল মৌলিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও মানুষের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ না থাকলে তার এ উচ্চশিক্ষার কোনো মূল্যই সমাজের মানুষ দিবে না। সুতরাং মানবীয় এসব শিক্ষা শিশুদের মাতৃকোড় থেকেই অর্জন করে নিতে হয়। মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন এসব শিক্ষা কোনো স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে কেউ শিখতে পারে না। তাকে এ মৌলিক শিক্ষা আপন পরিবার থেকে শিখে নিতে হয়। তাই শাওকী মাতৃকোড়কে মহাবিদ্যালয় হিসেবে অভিহিত করেছেন। কবির ভাষ্যমতে, মানুষ প্রকৃত শিক্ষা বাবা-মার কাছ থেকে শিখে থাকে। মাতৃকোড়ে শিক্ষা বিষয়ে কবি গুরুত্ব দিতে রচনা করেন الأم নামক কবিতাটি। কবি বলেন:

لولا التقى لقلت: لم يخلق سواك الولدا!
إن شئت كان العير' أو إن شئت كان الأسدا
و إن ترد غيا غوى أو تبغ رشدا رشدا
و البيت أنت الصوت فيه و هو للصوت صدى

الأم [১৩৬]

১৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৭
১৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৬

অনুবাদ:

যদি সাক্ষাৎ হতো, তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম তোমাকে ছাড়া জন্মদাতা সৃষ্টি হতো না।

তুমি চাইলে সন্তান বন্য গাধার ন্যায় হয় অথবা তুমি চাইলে সন্তান সিংহের ন্যায় হয়।

তুমি চাইলে (তোমার সন্তান) পথ ভ্রষ্ট হতে পারে। আবার তুমি চাইলে (তোমার সন্তানকে) সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারো।

ঘরে তুমিই প্রধান মুখপাত্র (অথচ) সে কণ্ঠের ধ্বনি যেন খাঁচায় আবদ্ধ তোতা পাখির আওয়াজের মতো। (খাঁচার পাখিকে যা বলা হয়) তা সে অনুকরণ করে।

কবির ভাষ্য হলো, তুমি সন্তানকে যা প্রশিক্ষণ দাও তাই সে গ্রহণ করে। তাদের যা শিখাবে তা তারা শিখবে। কবির মতে, মানুষ হলো অভ্যাসের দাস। সুতরাং ন্যায়-নীতির শিক্ষা সন্তানদের দেয়া বাবা-মায়ের প্রধান কর্তব্য। কবি অত্র কবিতায় একজন সন্তান মানুষ হওয়ার পেছনে মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, একজন মা-ই পারেন একটি সভ্য ও সুন্দর সমাজ উপহার দিতে। তিনি ইচ্ছে করলে তার সন্তানকে ন্যায়নীতি ও সততার সাথে গড়ে তুলতে পারেন। একজন মা চাইলে তাঁর সন্তানকে সিংহের ন্যায় সাহসী করে গড়ে তোলতে পারেন। তিনি চাইলে তাঁর সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। কবির মতে, সন্তানরা মাতৃকোড়ে থাকা অবস্থায় একটি প্রশিক্ষণালয়ের মতো প্রতিনিয়ত পরিবেশ ও বাস্তবতা থেকে শিখছেন। তাই এ সময় সন্তান যা শিখবে তা নিয়েই গড়ে ওঠবে তার ভবিষ্যৎ। সুতরাং একটি সুশৃংখল ও সুসভ্য সমাজ গড়তে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের এ ভূমিকার বিষয়ে কবি বার বার ইঙ্গিত দিয়ে মায়েদের সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। কবি জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তাঁর বিখ্যাত কবিতা رسالة الناشئة রচনা করেন। কবি বলেন:

اطلب العلم لذات العلم' لا
لظهور باطل بين الملا
رسالة الناشئة [১৩৭]

অনুবাদ:

"শুধু জ্ঞান অর্জন কর জানার জন্য।
জনতার মাঝে নিজের পান্ডিত্য প্রকাশের জন্য নয়।"

১৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২২

আহমাদ শাওকী তাঁর ديوان الشوقيات নামক সংকলনগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা নারীদের নিয়ে লিখেছেন। তিনি এসব কবিতার মাধ্যমে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

সে সময় নারীরা শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণে সীমাবদ্ধ ছিল। পুরুষরা যেভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত নারীরা ছিল এসব থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। এক্ষেত্রে নারীদের সুশিক্ষায় ও আধুনিক শিক্ষাদানে সর্বপ্রথম যিনি এগিয়ে এসেছেন তিনি হলেন আহমাদ শাওকী। নারী শিক্ষা বিষয়ক যে অজ্ঞতা সে সমাজে বিরাজমান ছিল তা থেকে উত্তোরনের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আহমাদ শাওকী। তিনি আধুনিক শিক্ষাদানে নারীদের সর্বদা উদ্বুদ্ধ করেন। আহমাদ শাওকী বিশ্বাস করতেন, একটি জাতির অগ্রগতির পূর্বশর্ত হলো সে জাতী-গোষ্ঠীর মানুষগুলো সুশিক্ষিত হওয়া। তাই শিক্ষার এ বৈষম্য থেকে আরব নারীকূলকে মুক্ত করার অবিরাম চেষ্টা করেন তিনি। তাই তিনি পুরুষদের ন্যায় নারীদের সুশিক্ষিত করার আহবান জানিয়ে রচনা করেন العلم و التعليم واجب المعلم নামক কবিতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সমাজের নারী-পুরষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। অন্যথায় দেশের উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। আর তাইতো নেপোলিয়ন [১৩৮] বলেছেন: তুমি আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব। অর্থ্যাৎ মায়েদের শিক্ষিত হওয়া বেশী প্রয়োজন। কারণ, নারী শিক্ষিত হলে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মও শিক্ষিত হবে। কবি বলেন:

وجد المساعد غيركم وحرمتم

فى مصر عون الأمهات جليلا

و إذا النساء نشأة فى أمية
رضع الرجال جهالة و خمولا
العلم و التعليم و واجب المعلم [১৩৯]

১৩৮। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) ফরাসি বিপ্লবের একজন জেনারেল ছিলেন। তিনি ১৮০৫-১৮১৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন। তিনি ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রথম কনসল এবং ইতালির রাজাও ছিলেন।

১৩৯। দিয়ানু আশ শাওকিয়াত, আহমাদ শাওকী, (১ম খণ্ড) পৃ. ২৪৭

অনুবাদ: "তোমাদের ছাড়াই সহযোগিতা পাওয়া গেছে। তবে মিসরের মাতৃকূলকে (শিক্ষা থেকে) ব্যাপকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।
যদি নারীরা নিরক্ষরতা নিয়ে বড় হয় তখন পুরুষরাও অজ্ঞতা ও মূর্খতার মাঝে লালিত পালিত হয়।"

এখানে কবি নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

কবির ভাষ্যমতে, নারীদের শিক্ষিত না করলে, তাদের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত না করলে সে সমাজ ও দেশের জন্য এর ফলাফল হবে মারাত্মক ক্ষতিকর। কারণ নারী অশিক্ষিত হলে সে সমাজে অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছড়াবে। সমাজের মানুষগুলো সঠিক পথ হারাবে। ফলে সমাজ ও দেশ অভাবনীয় ক্ষতির সম্মূখীন হবে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে নারীদের শিক্ষিত করার বিষয় জোর দিচ্ছেন কবি এ লাইনগুলোতে।

শাওকী مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات নামক কবিতায় ইসলামী যুগে নারীর শিক্ষা এবং সমাজে নারীদের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ কবিতায় শাওকী মুসলিম সমাজে নারী অগ্রগতির ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে সে সময়কার মিশরের নারীদের শিক্ষা দীক্ষায় সচেতনতার লক্ষ্যে নিচের কবিতাটি রচনা করেন।

কবি বলেন:

خذ بالكتاب' و بالحديث' و سيرة السلف الثقات
وارجع إلى سنن الخليفة' و اتبع نظم الحياة
هذا رسول الله' لم ينقص حقوق المؤمنات
العلم كان شريعة لنسائه المتفقهات
رضن التجارة' و السياسة' و الشئون الأخريات
مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات [১৪০]

কবি সমাজের মানুষদের সম্বোধন করে বলছেন:

"পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং পূর্ববর্তীদের জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতিকে আকড়ে ধর । খোলাফায়ে রাশেদীনদের পথে ফিরে যাও এবং তাদের সুবিন্যস্ত জীবন-চরিত অনুসরণ কর।

১৪০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

ইনি আল্লাহর রাসূল (স.) তিনি মুমিন নারীদের অধিকার কখনই সংকোচন করেননি।

বোধশক্তি সম্পন্ন নারীদের জন্য জ্ঞানার্জন আবশ্যক ছিল।

তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব পালনে সম্মতি প্রকাশ করতো।"

নারীরা মায়ের জাত। এ সম্মানিত জাতের প্রতি মর্যাদা দানের ইঙ্গিত প্রদান করে কবি বলেন:

قم حى هذى النيرات حي الحسان الخيرات
و اخفض جبينك هيبة للخرد المتخفرات

زين المقاصر الحجال و زين محراب الصلاة
هذه مقام الامهات فهل قدرت الامهات ؟
مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات [১৪১]

অনুবাদ:

"দাঁড়াও! এই আলোকসজ্জা প্রজ্জ্বলন কর এবং কল্যাণকর সৌন্দর্যকে জাগ্রত কর।

পরম শ্রদ্ধাভরে কুমারী লাজুক মেয়ের জন্য নিজেকে সোপর্দ কর।

প্রাসাদসমূহ, কনের আসর এবং ইবাদতের স্থান সজ্জিত করা হয়েছে।

এটা মায়েদের স্থান। তুমি কি মায়েদের প্রতি এভাবে সম্মান করবে না? "

সংস্কারপন্থী নারীদের মাধ্যমে মিসরের মর্যাদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে কবি বলেন:

فوجوههن و ماؤها ستر على المتجملات
مصر تجدد مجدها بنسائها المتجددات
النافرات من الجمود كانه شبح الممات
مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات [১৪২]

১৪১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১৪২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

অনুবাদ: "তাদের রূপ ও সজীবতা সৌন্দর্যে ঢাকা,

সংস্কারক নারীদের দ্বারা মিসরের মর্যাদার নতুনত্ব লাভ করবে।

মৃতদেহের আকৃতির মত স্থবিরতা থেকে তারা মুক্ত।"

কবি মনে করেন, নারীদের সুশিক্ষিত করলে এ নারীকূল মিসরের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে; এরাই মিসরের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

সমাজ জীবনে অন্যের উপকার করলে নিজেরও উপকার হয় এই মূল্যবান শিক্ষা দিতে কবি শাওকী الكلب و الحمامة নামক কাহিনীকাব্যটি রচনা করেন। ঘটনাটি ছিল এরূপ। একদিন একটি কুকুর বাগানে ঘুমে নিমগ্ন ছিল। ঠিক সেসময়, একটি অজগর সাপ কুকুরটিকে দংশন করতে আসতে দেখে কবুতরটি উড়াল দিয়ে এসে কুকুরটিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল। এতে করে সাপের কবল থেকে কুকুরটি রক্ষা পেল। পরোপকারের এ চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন:

حكاية الكلب مع الحمامة
تشهد للجنسين بالكرامة
يقال: كان الكلب ذات يوم
بين الرياض غارقا فى النوم
فجاء من ورائه الثعبان
منتفخا كأنه الشيطان
و نزلت توا تغيث الكلبا

و نقرته نقرة' فهبا
فحمد الله على السلامة
و حفظ الجميل للحمامة
الكلب و الحمامة' [১৪৩]

অনুবাদ:

কবুতরের সাথে এক কুকুরের কাহিনী
তুমি প্রত্যক্ষ করবে এখানে দু'প্রজাতির মহত্ব।
বলা হয়ে থাকে: একদিন একটি কুকুর ছিল
একটি বাগানে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত
তার পেছনে আসল এক অজগর সাপ
সে ছিল শয়তানের ন্যায় ভয়ংকর

১৪৩। আহমাদ শাওকী, আশ শাওকিয়াত (৪র্থ খণ্ড) পৃ. ৮৯৬

কবুতরটি তৎক্ষণাৎ কুকুরটিকে সাহায্য করতে নেমে এলো
সে তাকে ঠোকরাতে লাগল এবং কুকুরটি জেগে উঠল
তখন সে নিরাপদে থাকার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করল
এবং কবুতরটিকে ধন্যবাদ জানালো।

অন্য একটি ঘটনার অবতারণা করে কবি বলেন, এক বাদশা একদিন শিকারে বের হলেন। এমতাবস্থায় একটি গাছের চূড়ায় অন্যমনষ্ক কবুতরদের দিকে বন্দুকের তাক লাগানোর দৃশ্য কুকুরের চোখে পড়ে। তাই দেখে কুকুরটি দৌড়িয়ে গাছের কাছে যেয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। এতে কবুতরটি সতর্ক হয় এবং উড়াল দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এভাবে কুকুরটি বাদশার শিকার থেকে কবুতরটিকে রক্ষা করেন। কবি বলেন:

إذا مر ما مر من الزمان

ثم أتلى المالك للبستان
فسبق الكلب لتلك الشجرة

لينذر الطير كما قد أنذره
و اتخذ النبح له علامه

ففهمت حديثه الحماحة
و أقلعت فى الحال للخلاص

فسلمت من طائر الرصاص

[১৪৪] الكلب و الحمامة'

অনুবাদ: "অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল
অত:পর বাগানে এক রাজা আসল।
কুকুরটি তখন ঐ গাছের নিকটে গেল
পাখিটিকে সতর্ক করার জন্য যেভাবে সে সতর্ক করেছিল
সে ইঙ্গিত হিসেবে ঘেউ ঘেউ করে উঠল
আর কবুতরও তার কথা বুঝতে পারল।
সে তখনই বাঁচার জন্য উড়ে গেল
অত:পর সে গুলি থেকে বেঁচে গেল।"

১৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৬

কবুতরের সাথে কুকুরের এ কাহিনী দ্বারা কবি সমাজ জীবনে চলার পথে একে অপরের উপকারে এগিয়ে আসার শিক্ষা দিয়েছেন। কবির ভাষ্য মতে, সমাজ জীবনে একে অন্যের উপকার করা উচিত, আবার উপকারকারীর উপকার স্বীকার করে নিজেকে অন্যের উপকারে নিয়োজিত রাখা উচিৎ।

পরক্ষণে শিকারী চলে গেছে ভেবে কবুতরটি বাসা থেকে বের হয়ে আসল। সে সুযোগে শিকারী কবুতরটিকে তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলল। এতদ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

فبرزت من عشها الحمقاء
الحمق داء ما له دواء
فسقطت من عرشها المكين
و وقعت فى قبضة السكين
اليمامة و الصياد [১৪৫]

অনুবাদ:

অত:পর বোকা পাখিটি তার নীড় থেকে বের হয়ে আসল
নির্বুদ্ধিতা হলো এমন এক রোগ যার কোন ঔষধ নেই।
সে (পাখিটি) তার মজবুত (নিরাপদ) বাসা থেকে (তীরবিদ্ধ অবস্থায়) পড়ে গেল
আর (শিকারীর) ছুরির আওতায় চলে আসল।

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন শিক্ষা সংস্কারক কবি। তিনি শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে শিক্ষানুরাগী হিসেবে প্রমাণ করেন। আবার সে বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করে তিনি নিজেকে একজন বিদ্যোৎসাহী মানুষ হিসেবেও প্রমাণ করেন। তাঁর মতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য কেবলই কিছু শিখানো বা তথ্য জানানো নয় বরং ভাবতে শিখানো। তাঁর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে চিন্তা ও কল্পনার বিকাশ সাধন করা।" [১৪৬] এ বিষয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একাধিক বিখ্যাত কবিতা। তন্মধ্যে 'সুখ', 'ঝুলন', 'এবার ফিরাও মোরে' 'সমুদ্রের প্রতি' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবি বলেন:

চারি দিকে
দেখে আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর, স্থির শান্ত জল-
মনে হয়, সুখ অতি সহজ সরল।

সুখ [১৪৭]

১৪৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৫
১৪৬। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' এবনে গোলাম সামাদ, উপসম্পাদকীয়, নয়া দিগন্ত, প্রকাশকাল: ০৯ জুন ২০১৮ খ্রি.
১৪৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১২৫

আমাদের চারপাশে জানার ইচ্ছা নিয়ে তাকালে প্রকৃতি যে আমাদের নিয়মিত অনেক কিছু শিখায় তারই প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'সুখ' নামক কবিতাটি। কবি 'এবার ফিরাও মোরে' নামক কবিতায় শিক্ষা যে আমাদের চিন্তাশীল করে তোলে এবং বিশ্ব মানবতার জন্য উদারতা উপলব্দি শিখায় তা ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন:

সংকট-আবর্ত- মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে।

এবার ফিরাও মোরে [১৪৮]

সমুদ্রের দিকে মানুষ মনের চোখে তাকালে সে সমুদ্রও যে একটি শিক্ষালয় তা প্রমাণ করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। সমুদ্র থেকে তো ঝড়-বৃষ্টি, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস ইত্যাদির উৎপত্তি সুতরাং সমুদ্রের কাছে গেলে এসবের কারণ জানতে চাইলে, মানুষ এ বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়টিই কবি তাঁর কবিতায় কাব্যিক ছন্দে উপস্থাপন করেছেন।

কবি বলেন:

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার- বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝেখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে।

সমুদ্রের প্রতি [১৪৯]

দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাপনার সুবিধা-অসুবিধা ও সমস্যাবলি সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর দিক নির্দেশনাসমূহ হল:

১) সিলেবাস ও কারিকুলাম পদ্ধতি পরিবর্তন করা;

২) শুধু পরীক্ষা পাসই নয়। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করা;

১৪৮। প্রাগুক্ত, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১২৮

১৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ৪৪

৩) শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্য পাঠ্যবইয়ের বাইরেও অন্য বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করা;

৪) আনন্দের সাথে শিক্ষাদান বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান করা;

৫। শিশুরা হলো দেশের ভবিষ্যৎ প্রাণশক্তি সুতরাং শিশুশিক্ষা নিশ্চিত করা;

৬। ধন উপার্জনের চেয়ে জ্ঞান উপার্জনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া;

৭। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৮। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া;

৯। ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের সময় বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক রাখা;

১০। সমাজ কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে শিক্ষা-কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার প্রতি জোর দেয়া ইত্যাদি।[১৫০]

২। সামাজিক অপরাধ নির্মূলে সংস্কারমূলক কবিতা:

ক) মাদক সমাজের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে দেয়। মাদকের ব্যপ্তির ফলে জনজীবন সংকটাপন্ন ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত হয়। মানবিকতার বোধ শক্তিকে মলিন করে দেয়। শাওকী সমাজের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশায় এবং মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের আহবান জানিয়েছেন তাঁর ايها العمال নামক কবিতায়। কবি বলেন:

اهجروا الخمر تطيعون الله
أو ترضوا الكتابا
إنها رجس؛ فطوبى لامرئ كف و تاب
ايها العمال[১৫১]

অনুবাদ:

"মদ ত্যাগ কর। আল্লাহর আনুগত্য কর এবং কিতাব তথা আল কুরআনের নির্দেশনা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নাও।

নিশ্চয় (মদ্যপান) গর্হিত কাজ। সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য যে এসব (মদ) পরিহার করেছে এবং তওবা করেছে।"

১৫০। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা', ফজলুল হক সৈকত, দৈনিক যুগান্তর, প্রকাশকাল: ২৮ মার্চ ২০১৪ খ্রি.

১৫১। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬

সমাজের সকল অপকর্মের মূল হলো মাদকাসক্তি। কবি সমাজের এ গর্হিত চিত্র উপলব্দি করে সকলকে সতর্ক, সজাগ ও সচেতন করার চেষ্টা করেন। কবির ভাষ্যমতে, সমাজে সুখ, শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সমাজের ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের সমাজে বসবাসরত অসচ্ছল ও অনগ্রসর মানুষদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে কবি বলেন:

إنما العاقل من يجعل للدهر حسابا
فاذكروا يوم مشيب فيه فيكون الشبابا
إن للسن لهما حين تعلوا و عذابا
فاجعلوا من ما لكم للشيب و الضعف نصابا
وذكروا فى الصحة الداء اذا ما السقم نابا
ايها العمال [১৫২]

অনুবাদ:

"জ্ঞানবান সেই যে হিসেব করে চলে
সে দুর্দিনের কথা ভাবো যেদিন যুবকও কাঁদবে।
নিশ্চয় বয়স্কদের জন্য রয়েছে দুশ্চিন্তা যখন তারা ওপরে ওঠতে চায় ও আযাবের কষ্ট সহ্য করবে।
অতএব দুর্বল ও অক্ষমদের সার্বিক সহযোগিতা কর।
অসুস্থদের খোঁজখবর নাও এবং তাদের ঔষধের ব্যবস্থা কর"

অসুস্থ রোগীর সেবা করা আর অসচ্ছল ও অক্ষম ব্যক্তিদের সহযোগিতা করার প্রতি মানুষদের সচেতন করার চেষ্টা করেন কবি আহমাদ শাওকী। তিনি টাকার লোভে যুবতি নারীদের বিয়ে করা অথবা যৌতুক গ্রহণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন। এতদ বিষয়ে সর্তক করে রচনা করেন للست هدى নামক কাব্যনাট্যটি। এ কবিতায় তিনি নারীদের যৌতুক পাওয়ার আশায় বিয়ে করা একটি নির্যাতন বলে অভিহিত করেন। তিনি সামাজিক এসব অপকর্মের ধিক্কার জানিয়ে ইসলামী সভ্যতায় নারীর মর্যাদার কথা ব্যক্ত করেন তাঁর مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات নামক কবিতায়। আব্বাসী যুগে বাগদাদে মুসলিম নারীদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল উল্লেখ করার মতো। দামেস্ক ও স্পেনে উমাইয়া শাসনামলে নারীরা তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

১৫২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

সে কথা উল্লেখ করে কবি বলেন:

و حضارة الإسلام تنطق عن مكان المسلمات
بغداد دار العالمات و منزل المتأدبات
و دمشق تحت أمية أم الجوارى النابغات
و رياض اندلس نمين الهاتفات الشاعرات
مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات [১৫৩]

অনুবাদ: "ইসলামী সভ্যতা মুসলিম নারীদের মর্যাদার কথা বলে
বাগদাদ ছিল জ্ঞানী নারীদের আবাস আর নারী সাহিত্যিকদের গৃহ।
দামেস্ক উমাইয়াদের শাসনাধীন এবং শ্রেষ্ঠ নারী ব্যক্তিত্বদের মূল সান্নিধ্যে ছিল।
স্পেন নগরী নারী কবিদের আওয়াজে মুখরিত ছিল।"

খ) বাল্যবিবাহ একটি চরম সামাজিক অন্যায় কাজ। রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সোচ্ছার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'নব বঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় সামাজিকভাবে প্রচলিত এ ব্যধির কুফল উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ অনেক সমাজ সচেতন ও দায়িত্বশীল কবি। রবীন্দ্রনাথ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এভাবে কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। কবি বলেন:

"বর।। বাসরশয়নে
জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই।
এস, সব ভুলে আজি আঁখি তুলে
শুধু দুঁহু দোঁহা- মুখ চাই।
মরমে মরমে শরমে ভরমে
জোড়া লাগিয়াছে এক ঠাঁই-
যেন এক মোহে ভুলে আছি দোঁহে,
যেন এক ফুলে মুধু খাই
বর।। বল একবার, 'আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া 'কারে নাহি চাই'।
ওঠ কেন, ওকি, কোথা যাও সখী?
কনে।। আইমার কাছে শুতে যাই।"
নব বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ। [১৫৪]

১৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
১৫৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৯৯

অবুঝ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করে স্বামীর বাসর রাতের রাতি যাপনের চিত্র কবি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েকে বিয়ে করে স্বামী বড়ই বিব্রতকর অবস্থায় সময় কাটাচ্ছেন। স্বামী প্রেম নিবেদন করতে চাইলে অবুঝ মেয়েটি প্রেম-ভালোবাসার মর্মার্থ কিছুই বুঝেনি; বরং সে তার স্বামীর প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠে যায় এবং মায়ের কাছে রাত্রি যাপনের জন্য চলে যায়। এটুকুন মেয়ে স্বামী, বাসর, সংসার, প্রেম-ভালোবাসার কিছুই বুঝে না। এ বয়সের শিশুরা বন্ধুদের সাথে পুতুল খেলায় লিপ্ত থাকার কথা। তাইতো কবি স্বামীর ভাষায় অভিব্যক্তি তুলে ধরেন এভাবে:

বর।। তবে যাই সখী, নিরাশাকাতর
শূন্য জীবন নিয়ে।
আমি চলে গেলে এক-ফোঁটা জল
পড়িবে কি আঁখি দিয়ে?
বসন্তবায়ু মায়ানিশ্বাসে
বিরহ জ্বালাবে হিয়ে?
ঘুমন্তপ্রায় আকাঙ্ক্ষা যত
পরানে উঠিবে জিয়ে!
বিষাদিনী বসি বিজন বিপিনে
কী করিবে তুমি প্রিয়ে?
বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?
কনে।। দেব পুতুলের বিয়ে।
-নব বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ। [১৫৫]

কবিতার লাইনগুলোতে কবি স্পষ্ট করেন, এ বয়সের শিশু মেয়েটি প্রেম-ভালোবাসা নিবেদনের চেয়ে পুতুল খেলায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চায়। পুতুলকে সে বিয়ে দিচ্ছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েটি বিয়ের পর স্বামী সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা সে কিনা নিজেকে বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের মতো খেলাধূলায় ব্যস্ত রাখছে। তার পোষা বিড়ালটি বাড়ীতে রেখে আসায় খোলা আকাশের নিচে বাচ্চা বউটি কান্না করতে দেখে তার স্বামী তাকে কান্নার কারণ জানতে চেয়ে সান্ত্বনা দানে এগিয়ে আসলে বাচ্চা মেয়েটি নিম্নোক্ত বাক্যলাপ করে।

১৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

কবির ভাষায়:

বর।। কেন, সখী, কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে?
উষা কি তাহার শুকতারা-হারা,
তাই কি শিশির ঝরে?
বসন্ত কি নাই, বনলক্ষ্মী তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে?
উদাসিনী স্মৃতি কাঁদিছে কি বসি
আশার সমাধি- পরে?
খ'সে-পড়া তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে?
কী লাগি কাঁদিছ?
কনে।। পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে
অন্দরের বাগানে

-নব বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ। [১৫৬]

স্বামী ভেবেছিল তার স্ত্রী হয়ত আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার দৃশ্য দেখে খোলা আকাশের নিচে বসে হারিয়ে যাওয়ার বিরহে কান্না করছে। স্ত্রী কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে প্রত্যুত্তরে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তার পোষা বিড়ালটি বাবার বাড়ীতে রেখে এসেছে। এখন বিড়ালটির কথা মনে পড়ায় সে কান্না করছে। এভাবে রবীন্দ্রনাথ 'নব বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ' কবিতার মাধ্যমে আমাদের সমাজ জীবনের বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করেছেন। সমাজের এ কু-প্রথা থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সবাইকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে।

নিরানন্দময় সন্ন্যাসী জীবন কবির অপছন্দের। কারণ এ জীবনে কোন আনন্দ রস নেই। নেই কোনো প্রেম-ভালোবাসা। নেই কোনো প্রকৃতিকে উপলব্দি করার সুযোগ। তাই এ নিরস জীবন যাপনে কবি সকলকে নিরুৎসাহিত করেন। কবির ভাষ্যমতে, এ জগৎ

১৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

সংসারে থেকে এ সমাজের মানুষদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করাই উত্তম ও সার্থক জীবন। কবি এ সমাজ সংসারের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার বর্হিপ্রকাশ করে রচনা করেন 'প্রতিজ্ঞা' নামক কবিতা। কবি বলেন:

'যদি মনের মতন মন
না পাই জিনি,
.....
তবে হব না তাপস, হব না, যদি না
পাই সে তপস্বিনী।'

-প্রতিজ্ঞা। [১৫৭]

'প্রতিজ্ঞা' নামক কবিতার উপরোক্ত লাইনগুলোতে কবির নারী প্রীতি ও পার্থিব জীবনের প্রতি প্রবল ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ সংসারে সঠিক সময় সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহবান জানান 'পরামর্শ' নামক কবিতায়। কবির ভাষ্যমতে, জীবনে চলার পথে অনেক বাধা-বিপত্তি, কলহ-বিবাদ আসবে। জীবনের এ ধরনের উত্থান-পতনে সর্বদা সঠিক ও উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে। কবির দৃষ্টিতে, প্রতিটি সমাজে সমাজ সচেতন কিছু মানুষ থাকা প্রয়োজন। যারা মানুষদের সত্য ও সুন্দরের পথ দেখাবে। সব ধরনের অন্যায়-অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজকে রক্ষা করবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সমাজে এ ধরনের সুশীল ব্যক্তিবর্গ না থাকলে সমাজে অন্যায় অপরাধ বেড়ে যাবে; সমাজ কলুষিত হয়ে পড়বে।

তাইতো কবি বলেন:

"আজিকে, বন্ধু তোমাদের মুখে
-এ কেমনতর ভাষা!
আজি বলিতেছে, 'বসে থাকো বাপু,
ছিলো যাহা তাই ভালো।
যা হবার তাহা আপনি হইবে।
কাজ কি এতই আলো!"

-পরিত্যক্ত। [১৫৮]

১৫৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, পৃ. ৫৩
১৫৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৯০

সমাজের অন্যায়-অপরাধে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। অন্যায়-অপরাধ দূরিকরণে প্রতিবাদ না করলে এবং বাধা না দিলে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব নয়। কবির ভাষায় 'যা হবার তাহা আপনি হইবে' এমন চিন্তা চেতনা রাখা যাবে না। এরকম দায়িত্বজ্ঞান শূন্য হলে সমাজের মানুষদের অস্থিতিশীলতা বেড়ে যাবে। যেকোনো অন্যায় কার্যক্রমে বসে না থেকে সমাজের মানুষদের কথা চিন্তা করে এবং সমাজের কল্যাণার্থে তা বাধা দানে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এমনটিই জানিয়েছেন সমাজ সচেতন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শক্তি, সার্মথ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যায় দেখে যারা চুপ থাকে তাদের ধিক্কার দিয়ে কবি বলেন:

"কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ
বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ
নিতান্ত সাবধান।
আনন্দে যারা চলিতে চাহিছে
ছিঁড়ি অসত্যপাশ,
ঘর হতে বসি করিছ তাদের
উপহাস পরিহাস।"

-পরিত্যক্ত। [১৫৯]

কবিতার আলোকে কবি সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, সমাজের কিছু মানুষের লিখনীর মাধ্যমে, কিছু সংখ্যক গান গেয়ে, আবার কিছু মানুষের অন্যায়-অপরাধ ও যুলুম-নির্যাতন বিষয়ে সাবধান ও সর্তক করার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও শান্তির সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। অথচ আজকে এসব থেকে সমাজের মানুষগুলো নিজেদের গুটিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। ফলে সমাজ হয়ে পড়ছে বিকলাঙ্গ। সমাজে অন্যায় ও অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। সমাজ থেকে ওঠে যাচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা। কবির নির্দেশনা হলো একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে আমাদের সচেতনার সাথে কাজ করতে হবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। আমাদের প্রিয় নবী রাসূল (স.) এতদ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে। প্রিয় নবী এরশাদ করেছেন "সমাজে অন্যায়-অপরাধ দেখলে তা প্রথমে হাত দিয়ে প্রতিহত করবে আর তাতে সক্ষম না হলে

১৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করবে আর এটাও না পারলে মনে মনে ঘৃণা করবে। আর এটা হবে দুর্বল ঈমানের পরিচয়" [১৬০] অর্থ্যাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সচেতন থাকতে হবে। অন্যথায় সমাজে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং, নারী নির্যাতন ইত্যাদি অপকর্ম বেড়ে যাবে।

সমাজপতিরা সর্বদা সমাজের মানুষ থেকে দূরে থাকে। তারা নিজেদেরকে একটি আলাদা ও ভিন্ন সত্ত্বা মনে করে। তাদের আবরণে সাধারণ মানুষদের মতো কবিও ব্যথিত হয়ে লিখেন:

হেসে ভালোবেসে দুটো কথা কয়
রাজ সভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়।
মন্ত্রী হইতে দ্বারী মহাশয়
সবে গম্ভীর মুখ। -পুরস্কার। [১৬১]

আমাদের কতিপয় সমাজ প্রতিনিধিদের মানসিকতা ও চিন্তা-ভাবনার চিত্র কবি উপরোক্ত কবিতার লাইনগুলোতে বর্ণনা দিয়েছেন। এসব জনপ্রতিনিধিরা মানুষদের দ্বারে দ্বারে গমন করে সমাজের সকল স্তরের মানুষদের সমর্থন যোগানোর চেষ্টা করে। সমাজের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে সমাজের মানুষদের কথা বেমালুম ভুলে যায়। সমাজের মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণের কথা মনে রাখে না। তারা নিজেদের সম্পদশালী ও ধনবান করার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় অবর্তীণ হয়। এলাকার মানুষ তাদের কাছে নিজের ও সমাজের উন্নয়নের দাবি জানাতে আসলে তারা মানুষদের মোটেই মূল্যায়ন করে না। সমাজের মানুষদের সাথে বড় অন্যায় আচরণ করে। যেমনি কবির সাথে রাজদরবারে করেছিল। কবি বলেন:

আমি শুধু এক কবি।
রাজা কহে, বটে! এসো এসো তবে,
আজিকে কাব্য আলোচনা হবে।
বসাইলা কাছে মহাগৌরবে
ধরি তার কর দুটি।

১৬০। ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), সহীহ মুসলিম শরীফ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০১০ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১

১৬১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ৮৩

মন্ত্রী ভাবিল, যাই এই বেলা,
এখন তো শুরু হবে ছেলেখেলা-
কহে,! মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি- -পুরস্কার।[১৬২]

কবির আগমনে রাজা খুশী হলেও সভাসদগণ তা স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। কবিকে রাজা ভদ্রতা স্বরূপ বসার আহবান জানিয়েছেন। সভাসদদের কবির কবিতা শুনার আহবান জানালে সভার মন্ত্রীবর্গ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে রাজসভা ত্যাগ করেন। এতে কবির কবিতা শুনার মতো শুধু কবি ও রাজাই ছিলেন। মন্ত্রীবর্গের এ আচরণে কবি কষ্ট পেয়েছেন। সাধারণ মানুষদের সাথে এটি তাদের নিয়মিত আচরণ। যা কখনই কাম্য নয়। আমাদের সমাজে পারিবারিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়। সমাজের এ চরম বাস্তবতার কথা কবি 'সোনার তরী' কাব্যের 'বিশ্বাবতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' প্রভৃতি কবিতায় উল্লেখ করেছেন। কবি বলেন:

"অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রানীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মতো।
চীৎকার কহিল রাণী কর হানি বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।" বিশ্বাবতী।[১৬৩]

আমাদের সমাজ সংসারের নিত্য দিনের সতীন ও সতীন কন্যার ষড়যন্ত্র ও বিবাদের বাস্তব চিত্র কবি ফুটে তুলেছেন এ কবিতার মাধ্যমে। সংসার জীবনে সতীন এবং সতীন-কন্যা যেন হিংসার পাত্র। রাণী সতিন কন্যার রূপ সৌন্দর্যে হিংসার আগুনে পুড়ে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার বর্ণনা এসেছে 'বিশ্বাবতী' কবিতার উপরোক্ত লাইনগুলোতে। কবির ভাষ্যমতে, হিংসা আমাদের সংসারের সুখ-আনন্দ বিনষ্ট করে দেয়। আমাদের পারিবারিক

১৬২। প্রাগুপ্ত পৃ. ৮৩
১৬৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ১১

সুসম্পর্ক নষ্ট করে। বস্তুত যে হিংসুক সে নিজেই হিংসার আগুনে পুড়ে মরে। অথচ অন্যকে তা সামান্য পরিমানও স্পর্শ করে না। যেমনটি ঘটেছে 'বিশ্বাবতী' কবিতার জ্ঞানহারা রাণীর ক্ষেত্রে। কবিতায় রাজরাণী চরিত্রটি মূখ্য হলেও কবিতার বিষয়বস্তু সার্বজনিনতাকে স্পর্শ করেছে। আমাদের সমাজ সংসারের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পরিবার ও সমাজ জীবনকে করে তোলছে উদ্বিগ্ন ও বিপদগামী। 'বিশ্বাবতী' কবিতায় রাণী ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের পরিবার ও সমাজের মানুষগুলোকে এসব পরিহার করার পরোক্ষভাবে আহবান জানান কবি। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন: "তোমরা হিংসা পরিহার কর। কেননা, হিংসা ভালকাজকে সেরূপ খেয়ে ফেলে, যেরূপ আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।" [১৬৪] সুতরাং আমাদের উচিত সমাজ বাস্তবতা অনুধাবন করে এসব অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা। রবীন্দ্রনাথ জমিদার বাড়ীর সন্তান হলেও তাঁর চলাচল ছিল সাধারণ মানুষের মতো। তিনি সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষদের জীবন চিত্র দেখেছেন খুব কাছ থেকে। সমাজের মানুষদের প্রতি প্রভাবশালীদের বিভিন্ন অত্যাচার-নির্যাতন কবিকে ভীষণভাবে ব্যথিত করতো। তিনি সর্বদা এসব অসহায় মানুষদের পক্ষে ছিলেন। তিনি সমাজপতিদের মিথ্যা অভিযোগ ও ষড়যন্ত্রের চিত্র উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'দুই বিঘা জমি' নামক কবিতায়। কবির দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিল, সর্বদা তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। সমাজের মানুষদের দুঃখ ঘুচিয়ে সুখ আনবার প্রাণপণ প্রয়াস কবির কাব্য শৈলীতে পরিলক্ষিত হয়।

কবির ভাষায়: 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি;
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।'

-দুই বিঘা জমি। [১৬৫]

কবি সমাজের অর্থশালীদের লোভ ও জিঘাংসার বাস্তব চিত্র এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজে যাদের ধন-সম্পদ যতবেশী তাদের চাহিদা ততোবেশি। এক্ষেত্রে অন্যায় উপায় অবলম্বন করতেও দ্বীধা করে না। 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় 'উপেন' নামে এক অসহায়

১৬৪। ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান (র.), সুনানে আবু দাউদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০০৬ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫১০

১৬৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১৩৮

মানুষের করুণ চিত্র উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সে বিষয়টিই কবি ফুটিয়ে তোলেছেন। 'উপেন' এর মাথা গোজার মতো অল্প কিছু জমি ছিল; কিন্তু জমিদার সামান্য জমির লোভ সামলাতে পারেনি। রাজার সহযোগিতা নিয়ে 'উপেন'- এর এ সামান্য জমি জমিদার অন্যায়ভাবে দখল করে নিয়ে যায়। আমাদের সমাজ জীবনে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। দুর্বল-অসহায়দের পক্ষে কেউ নেই। ফলে প্রভাবশালী ও ধনশালীদের সমাজে এতোটা আধিপত্য। কবি সামাজিক এ ধরনের আচরণের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে কবিতার মাধ্যমে তা পরিহারের আহবান জানিয়েছেন। সমাজের অবহেলিত মানুষদের প্রতি তার মনোভাবের কথা তুলে ধরেছেন 'পুরাতন ভৃত্য' নামক কবিতায়। সমাজের নিম্নশ্রেণির অসহায় মানুষগুলো সর্বদা উচ্চবিত্ত দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছে। নিম্ন শ্রেণির মানুষগুলো শত বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে উচ্চবিত্তদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। তারা সমাজের প্রভাবশালী ও উচ্চবিত্তদের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করছে। অথচ উচ্চবিত্ত ও প্রভাবশালীরা এ ধরনের সহযোগিতা ও উৎসর্গকে নিম্নশ্রেণির মানুষদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব হিসেবে চিন্তা করছে। তাদের এহেন মনোবৃত্তির কথা তুলে ধরে কবি বলেন:

'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর-
যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে-
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ, চীৎকার করি 'কেষ্টা'-
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।'

পুরাতন ভৃত্য। [১৬৬]

সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষদের দাম্ভিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির চিত্র উপরোক্ত লাইনগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষদের প্রতি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, অবিচার ও অবহেলা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাদের আর্ত্মনাদ শোনার সুযোগ ও সময় নেই উচ্চশ্রেণির মানুষদের। তাদের জন্মই যেন উচ্চশ্রেণির মানুষদের ভৃত্য স্বরূপ। উচ্চশ্রেণির এ আচরণ আমাদের সমাজে সর্বদা পরিলক্ষিত হয়। এরা নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয় কিন্তু তাদের পক্ষে দাড়াবার কেউ নেই।

১৬৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১৩৬

এ জগৎ সংসারে চলার পথে সুখ-দুঃখ ও সাফল্য-ব্যর্থতা বিদ্যমান। এটাই বাস্তব সত্য। এ সত্যকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই; বরং জীবনের সকল অবস্থায় বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে জীবনের সফলতা ও সার্থকতা বিদ্যমান। এ ধারারই একটি চেতনাজাত কবিতা হলো 'বোঝাপড়া' কবিতাটি। কবি বলেন:

"অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
.....
মনেরে তাই কহ যে,
ভালোমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।" বোঝাপড়া। [১৬৭]

চলার পথে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলার সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনই একজন সফল মানুষের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা যদি সবর্দা দুঃখ-কষ্ট ও ব্যর্থতা-গ্লানিকে শক্তিতে পরিনত করতে পারি, তবেই আমাদের সফলতা আসবে।

আমাদের সমাজ সংসারে নানা ঝুট-ঝামেলা, ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা, শালিশ-নালিশ ইত্যাদি নিষ্পত্তির জন্য প্রৌঢ় বা বয়স্কদের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। কারণ প্রৌঢ়রা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে সক্ষম। এ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো 'শাস্ত্র'। কবি বলেন:

"পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে। শাস্ত্র। [১৬৮]

কবির ভাষ্যমতে, প্রৌঢ়রা নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞ। সুতরাং সমাজ সংসার থেকে দূরে থেকে নয়; এ জগৎ সংসারে অবস্থান করেই সমাজ জীবনের মানুষদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে করতে হবে।

১৬৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, পৃ. ৩৫
১৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

'এবার তবে ক্ষান্ত হয় রে,
ওরে শ্রান্ত তরী!
রাখ্ রে আনাগোনা।
বর্ষশেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যাগগন ভরি
ওই যেতেছে শোনা'

-পরামর্শ। [১৬৯]

এখানে জীবনের সম্ভাবনা ও প্রাণচঞ্চলতাকে তরীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। বার্ধক্য মানুষের শক্তি ও সক্ষমতাকে ক্লান্ত ও শ্রান্ত করে তুলে। জীবনের এ ক্লান্তিলগ্নে সাহসিকতার সাথে চলার আহবান জানান কবি 'পরামর্শ' কবিতার উপরোক্ত লাইনগুলোতে।

৩। সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংস্কারমূলক কবিতা:

ক) কবি আহমাদ শাওকীর বিভিন্ন কবিতায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অধিকার নিশ্চিত করার আহবান পরিলক্ষিত হয়। কবির ভাষ্য মতে, ইসলামী শরিয়ত নারীদের সকল অধিকার নিশ্চিত করেছে। অথচ আমরা তাদের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি। এটি একটি মূর্খ ও অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ। কবি সকলকে ইসলামী সমাজ সভ্যতার অতীত ইতিহাস ফিরে দেখার এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্গ অনুসরণ করার আহবান জানান। কবি বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস পড়ে দেখলে সকলের নিকট সুস্পষ্ট হবে যে, ইসলামে সর্বত্র নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। রাসূল (স.) সর্বপ্রথম নারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন। নারীদের মায়ের আসনে বসিয়েছেন আর ঘোষণা করেছেন:

الجنة تحت رجليها [১৭০]

"মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশ্ত"।

১৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১৭০। ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আল নাসাঈ (র.), সুনানু নাসাঈ শরীফ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০০৮ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯০

মহান আল্লাহ নারী তথা মায়ের সাথে অসম্মানজনক আচরণ না করার আহবান জানিয়ে বলেন:

فلا تقل هما أف ولا تنهرهما [১৭১]

"তাদের প্রতি (বিরক্ত হয়ে) উহ্ বলবে না এবং তাদের ধমক দিও না।"

সুতরাং তাদের খেদমত করতে যেয়ে বিরক্ত হয়ে কিংবা অসম্মান করে উহ্ শব্দ বলা যাবে না। ইসলাম পিতা-মাতা ও স্বামী-সন্তানের সম্পত্তিতে নারীদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছেন। কবি বোঝাতে চাচ্ছেন, যেখানে ইসলাম নারীদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে সেখানে আমরা মিসরবাসী কেন নারীদের তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবো। তাই কবি তাঁর কবিতার মাধ্যমে নারী অধিকার নিশ্চিতকরণে মিসরবাসীদের সচেতন করেছেন। তিনি নারীদের পাখির খাঁচার মতো শৃঙ্খলিত চার দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ না রাখার আহবান জানিয়ে রচনা করেন بين الحجاب و السفور নামক কবিতাটি। উক্ত কবিতায় কবি মিশরবাসীকে অজ্ঞতা আর মূর্খতার ভয় দেখিয়ে বলেন:

اسمعْ فرب مفصل لك ؛ لم يفدى كمجمل

صبرا لما تشقى به أو ما بدا لك فافعل

إن طرت عن كنفى وقعت على النسور الجهل

بين الحجاب و السفور [১৭২]

অনুবাদ:

"শুন! কতেক ব্যাখ্যাকারী আছেন যারা তোমাদের বিষয় অসম্পন্ন ব্যাখ্যা করেন। ধৈর্য্যের সাথে তাদের অভিযোগ মোকাবেলা কর। অথবা, যা নিজের জন্য আবশ্যকীয় মনে কর তা করতে থাক।

এসব নিয়ে যদি না ভাবো তবে মনে রেখ, অজ্ঞতা ও মূর্খতার মাঝে তোমরা পতিত হবে।"

১৭১। আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৩

১৭২। আশ-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০

খ) নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সোচ্চার। তিনি নারীমুক্তি ও নারী উন্নয়নে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। নারীহৃদয়ের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশে জোর দিয়েছেন। সুখকর সমাজ সংসার প্রতিষ্ঠার ধারণা তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। কবি অবহেলিত নারীগোষ্ঠীকে সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণে অবিরাম চেষ্টা করেছেন। তিনি নারী হৃদয়ের বাস্তব চিত্র 'ব্যক্ত প্রেম' নামক কবিতায় উপস্থাপন করেন। কবি বলেন:

"লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত!
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো
ভাঙিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়!
লাজে-ভয়ে থরথর ভালোবাসা-সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িয়ে নিদয়!"

ব্যক্ত প্রেম [১৭৩]

সংসার জীবনে নারীর প্রতি ভালোবাসা তাঁর প্রাপ্য অধিকার। এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু কাজ করেছেন। তিনি নারীর মানসিকতা কথা উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'নারীর উক্তি' নামক কবিতায়।

কবির ভাষায়:

"আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মান প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয়– প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান"

নারীর উক্ত [১৭৪]

রবীন্দ্রনাথ নারী হৃদয়ের সুন্দর ও অনুপম মানসিকতার কথা ব্যক্ত করে রচনা করেন 'নারীর উক্তি' কবিতার নিম্নোক্ত লাইনগুলো। কবি বলেন:

তুমিই তো দেখালে আমায়
প্রেম দেয় কতখানি– কোন্ হাসি, কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালোবাসা।

১৭৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৫৭
১৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে

বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা–

আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,

এই দূরে চলে যাওয়া, এই কাছে আসা।

-নারীর উক্তি। [১৭৫]

নারীরা সামাজিকভাবে সকল মৌলিক অধিকার সমানভাবে পাবে এটাই কবির প্রত্যাশা। নারী অধিকার নিশ্চিতকরণে রবীন্দ্রনাথ কবিতার মাধ্যমে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সমাজে নারী যে কল্যাণময়ী তারই বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'রাত্রে ও প্রভাতে' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

"তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী, হাসিমুকুলিত মুখে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে নবীনমিলন সুখে।
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জননদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী বাঁশিতে উঠেছে বাজি
এই নির্মলবায় শান্ত উষার রাগিনী জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণসিঁদুররেখা
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা!"

-রাত্রে ও প্রভাতে। [১৭৬]

১৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৭৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১৫৪।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ বাস্তবতা নিয়ে সর্বদা চিন্তা করতেন এবং তা কাব্যিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করতেন। সমাজ বিষয়ক তাঁর কবিতা প্রায় সকল কাব্যগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। কবি বিশ্বাস করতেন, সাফল্যময় জীবনের জন্য প্রয়োজন সমাজের মুখোমুখি হওয়া। সমাজে ঐক্যবদ্ধভাবে মিলে মিশে বসবাস করা। জাতি-ধর্ম, বর্ণ ও বংশ নির্বিশেষে একে অন্যের দুঃখে ব্যথিত হওয়া এবং পাশে থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার করা। তাঁর এহেন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায় 'চিত্রা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়।

৩য় পরিচ্ছেদ

দেশের উন্নয়নে শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তা

দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সমাজের মানুষদের ভূমিকা নিয়ে কবিতা রচনা করছেন শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ। তারা বিশ্বাস করতেন, দেশের উন্নয়নে সমাজের সকল স্তরের মানুষদের সমানভাবে এগিয়ে আসা উচিৎ। তবেই দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়ন সম্ভব।

১। ক) সৎ, চরিত্রবান এবং সাহসী দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টির আহবান: **কবি আহমাদ** শাওকী সমগ্র আরব সমাজের মানুষদের নিয়ে কবিতা রচনা করেন। তিনি আরব জাতিকে এক দেহের ন্যায় মনে করতেন। দেহের কোন অংশ ব্যথিত হলে যেমন সর্বাঙ্গ ব্যথা অনুভব হয়। ঠিক তেমনি আরবরা কষ্টে থাকলে সমগ্র আরব জাতি কষ্ট অনুভব করে। কবি বলেন:

و نحن فى الشرق و الفصحى بنو رحم

و نحن فى الجرح و الآلام إخوان

دمشق [১৭৭]

অনুবাদ: "আমরা প্রাচ্যে অবস্থান করছি এবং আমরা প্রাঞ্জলভাষী (একই) রক্তের সন্তান

আমরা আহত অবস্থায় রয়েছি, আর আমাদের দুঃখ-কষ্ট (এতোই আপন যে তা)

ভ্রাতৃতুল্য"

কবির আরো বলেন:

كلما أن بالعراق جريح

لمس الشرق جنبه فى عمانه

تحية الشاعر [১৭৮]

অনুবাদ: " যখনই ইরাকের কেহ আহত হয়

তখন সমগ্রপ্রাচ্য তার বেদনায় ব্যথিত হয়ে সমবেদনা জানায়।"

উপরোক্ত কবিতা আরব জাতির সামাজিক সুদৃঢ় বন্ধন ও ঐক্যের ইঙ্গিত বহন করে।

১৭৭। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫

১৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮

তিনি মিসরকে স্বাধীন ও সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্রে পরিনত করার জন্য মিসরীয় সমাজের মানুষদের কবিতার মাধ্যমে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করেন। তিনি শুধু মিসর নয় সিরিয়া, লেবানন ও ইরাকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন এবং আরব সমাজকে মতবিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। এতে প্রমাণিত যে, তিনি আরব সমাজকে সহিংসতা ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন । কবি বলেন:

و ما الشرق إلا أسرة أو عشيرة
تلم بنيها عند كل مصاب

يعفوب صروف [১৭৯]

অনুবাদ: "প্রাচ্য একটি পরিবার কিংবা একটি আত্মীয়স্বজনের ন্যায়
প্রতিটি বিপদ-আপদে তার সন্তানদেরকে একত্রিত করে।"

এভাবে তিনি সমগ্র আরব জগতের একজন সার্বজনীন কবি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। আহমাদ শাওকীর نشيد مصر নামক কবিতার মাধ্যমে মিসরীয় সমাজের মানুষদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন এবং মিসরীয় সমাজের যুবকদের দেশ বিনির্মাণে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। কবি বলেন:

بنى مصر مكانكمو تهيا فهيا مهدوا للملك هيا
خذوا شمس النهار له حليا ألم تك تاج أولكم مليا؟
على الأخلاق خطوا الملك و ابنوا فليس وراءها للعز ركن

نشيد مصر [১৮০]

অনুবাদ: "হে মিশরের সন্তানরা! বর্তমানে মিসরে তোমাদের অবস্থান তৈরি হয়েছে।
সুতরাং এখন তোমরা সাম্রাজ্যের পথ সুগম করার জন্য দ্রুত এগিয়ে এসো।
দিনের সূর্যকে রাজত্বের অলংকার হিসেবে গ্রহণ কর। তোমাদের পূর্বপুরুষদের
রাজত্বের মুকুট কি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে?
রাজত্বকে পরিচালনা করবে সৎ ও সুন্দর চরিত্র দিয়ে এবং (মনে রাখবে) মর্যাদার মূল ভিত্তিই হলো সৎচরিত্র।"

১৭৯। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১৬
১৮০। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০৮

দেশের প্রতি ভালোবাসা সমাজের তৃণমূল থেকে সৃষ্টি করতে হবে। সমাজের মানুষরা যখন দায়িত্ববোধ নিয়ে বড় হবে তখন দেশের প্রতি স্বাভাবিকভাবে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং দেশপ্রেম বৃদ্ধি পাবে। শাওকী মিসরের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং উৎসর্গী মানসিকতার কথা ব্যক্ত করে সকলকে দেশপ্রেমিক নাগরিক হওয়ার আহবান জানিয়ে রচনা করেন نشيد مصر নামক কবিতাটি। এখানে কবি বলেন:

لنا وطن بأنفسنا نقيه و بالدنيا العريضة نفتديه

إذا ما سيلت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعط شيا

نشيد مصر [১৮১]

অনুবাদ: "আমাদের একটি জন্মভূমি আছে, এ বিশাল পৃথিবীর বিনিময় হলে আমরা তা রক্ষা করব।

যদি প্রাণ উৎসর্গ করার প্রয়োজন হয়, তবে তা আমরা নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করব।"

দেশের প্রতি আত্মোৎসর্গের কথা ব্যক্ত করে কবি বলেন:

إليك نموت مصر كما حيينا
و يبقى وجهك المفدى حيا

نشيد مصر [১৮২]

অনুবাদ: "হে (আমার প্রিয় জন্মভূমি) মিসর! তোমার জন্য যেমনি আমরা বেঁচে থাকতে চাই তেমনি মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত।
আর তোমার উৎসর্গী প্রিয়তম ভূখণ্ডের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।"

জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার আহবান জানিয়ে কবি তাঁর رسالة الناشئة নামক কবিতায় বলেন:

كن إلى الموت على حب الوطن

من يخن أوطانه يوما يخن

رسالة الناشئة [১৮৩]

অনুবাদ: "আমৃত্যু জন্মভূমিকে ভালোবাসো।
যে জন্মভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে একদিন জন্মভূমিও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।"

১৮১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৮
১৮২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৮
১৮৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২২

সৎ, চরিত্রবান ও দেশ প্রেমিক হওয়ার কথা ব্যক্ত করে কবি বলেন:

فى الصدق نشأنا و الكرم و العفة عن مس الحرم
و رعاية طفل أو هرم و الذود عن الغيد الحصن

[১৮৪] نشيد الكشافة

অনুবাদ: "হারাম থেকে দূরে থেকে আমরা সততা, উদারতা ও পবিত্রতার মাঝে বড় হয়েছি। (আমরা) শিশু ও বৃদ্ধের তত্ত্বাবধায়ক এবং সতী সুন্দরী নারীর রক্ষক।"

দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করে কবি বলেন:

و لا نسأله ثمن المهج و كفى بالواجب من ثمن
يارب' فكثرنا عددا و ابذل لأبوتنا المددا
هيئ لهم و لنا رشدا يارب' وخذ بيد الوطن

[১৮৫] نشيد الكشافة

অনুবাদ: "আমরা তার কাছে জীবনের মূল্য চাইবো না; বরং আমাদের দায়িত্ববোধই মূল্যের মাপকাঠির জন্য যথেষ্ট।

হে রব! আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দাও এবং আমাদের পুরুষদের সাহায্য কর। আমাদের ও তাদের জন্য সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দাও। হে রব! তুমি আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা কর।"

শিশুদের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর তারা যে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ এ কথা ব্যক্ত করে কবি বলেন:

أحب الطفل و إن لم يكن لك
إنما الطفل على الأرض ملك

[১৮৬] رسالة الناشئة

অনুবাদ: "আমি শিশুদের ভালোবাসি। যদিও তোমার মধ্যে সে ভালোবাসা নাও থাকতে পারে। নিশ্চয়ই আজকের শিশু আগামী পৃথিবীর রাজা।"

১৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৯
১৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৯
১৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৪

কবি আরো বলেন:

نحن الكشافة فى الوادي جبريل الروح لنا حادى
يارب بعيسى' و الهادي و بموسى خذ بيد الوطن
كشافة مصر و صبيتها و مناة الدار' و منيتها
و جمال الأرض' و حليتها و طلائع أفراح المدن
نبتدر الخير' و نستبق ما يرضى الخالق و الخلق

[১৮৭] نشيد الكشافة

অনুবাদ: "নীল নদের উপত্যকায় আমরা স্কাউট দল। রুহুল আমীন জিবরাঈল (আ.) আমাদের পরিচালক।
হে রব! ঈসা ও মুসা (আ.) এবং প্রদর্শক মুহাম্মদ (স.) এর উসিলায় তুমি আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা কর।
মিসরের স্কাউট দল হলো মিশরের শিশুরা। তারা দেশের মর্যাদা ও সম্মান এবং দেশের ভবিষ্যৎ।
তারা পৃথিবীর সৌন্দর্য ও মূল্যবান অলংকার এবং বিভিন্ন শহরের (মানুষের মাঝে) আনন্দ ও শান্তি অন্বেষণকারী।
আমরা (স্কাউট দল) উত্তম ও কল্যাণের দিকে ছুটে চলি এবং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই। যা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করে।"

কবি উপরোক্ত লাইনগুলোতে মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের স্কাউট দল ভূমিকা রাখবে। দেশের শান্তি, সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান কবি। কবির বিশ্বাস, দেশের প্রতি এ দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতা দেশের নাগরিকদের মাঝে সামাজিকভাবে জাগ্রত করা প্রয়োজন। কবি আরো বলেন:

فى السهل نرف رياحينا و نجوب الصخر شياطينا
نبني الأبدان و تبنينا و الهمة فى الجسم المرن
و نخلي الخلق و ما اعتقدوا و لوجه الخالق نجتهد
نأسوا الجرحى أني و جدوا و نداوي من جرح الزمن

[১৮৮] نشيد الكشافة

১৮৭। প্রাগুক্ত পৃ. ৯০৯
১৮৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৯

অনুবাদঃ

"আমরা (স্কাউট দল) নরম ভূমিতে সুগন্ধি ছড়াই এবং আমাদের (দেশ বিরোধি) শয়তানদের পাথর নিক্ষেপের মতো (তাদের কথার) জবাব দিই।

আমরা আমাদের এবং আমাদের দেহকে প্রস্তুত করেছি। সাহসিকতা তো শারীরিক কসরত যা দেহে থাকে।

তারা যে আমাদের প্রতি বিশ্বাস রাখে (সে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়ে) আমরা সৃষ্টি জগতকে মুক্ত করব এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভে আমরা (দেশের জন্য) পরিশ্রম করে যাবো।

(আমাদের চলা পথে) যেখানেই অসুস্থ ব্যক্তি/ আহত ব্যক্তি পাবো (সেখানেই) আমরা তাদের সেবা শুশ্রুষা করব এবং কালের যে ক্ষত লেগেছে যা তো আমরাই ঠিক করব।"

দেশের যুব সমাজ, যাদের কবি স্কাউট দল নামে অভিহিত করেছেন। তাদের তিনি দেশের উন্নয়নে উজ্জীবিত হওয়ার আহবান জানান। কবির বিশ্বাস, যুবকরাই দেশের জন্য সুনাম সুখ্যতি বয়ে আনতে পারে। তারাই দেশ বিরোধিদের জন্য হুঙ্কার ও আতঙ্ক। তারা দেশ রক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সাহসিকতার সাথে দেশের উন্নয়নে কাজ করবে। দেশের সমৃদ্ধি আনয়নে সর্বোচ্চ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পরিশ্রম করে যাবে। যুবকরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি মানুষদের জন্যও কাজ করবে। তারা অসুস্থ, রুগ্ন ও আহত ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রুষায় নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। সমাজের মানুষদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাবে। কবি আরো মনে করেন, যুবকরাই এ সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তারা যদি সমাজের মানুষের জন্য কাজ করে তবে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি তরান্বিত হবেই। সুতরাং ঘরে বসে না থেকে যুবকদের এসব সেবায় নিয়োজিত হবার আহবান জানান কবি।

(খ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালী জাতীকে যে কোন পরিস্থিতিতে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। তিনি সংকীর্ণ মানসিকতা পোষণকারীকে হীনমন্য জাতি হিসেবে অভিহিত করেন এবং তাঁর 'দুরন্ত আশা' নামক কবিতায় তাদের সংকীর্ণ

মানসিকতা পরিহারের আহবান জানান। বাঙালির আচরনিক বিষয়ে আক্ষেপ করে কবি বলেন:

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি
গৃহের প্রতি টান-
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে- ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালিসন্তান দুরন্ত আশা [১৮৯]

ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালির ভয়-ভীতি ও কাপুরুষত্বের চিত্র কবি 'দুরন্ত আশা' কবিতার উপজীব্য হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কবি অনেকটা আক্ষেপ করেই বাঙালিদের নম্র-ভদ্র ও শান্ত বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, যখন শত্রুরা বাঙালির ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিচ্ছে; বাঙালিদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করছে; ঔপনিবেশিক শত্রুদের তখন নির্যাতন মেনে নিয়ে নিশ্চুপ থাকা নম্র ও ভদ্রতার লক্ষণ নয়; বরং তা ভীরুতা ও কাপুরুষত্বের লক্ষণ। বাঙালি সমাজের এসব লোকদের প্রতি ধিক্কার দিয়ে কবি বলেন:

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন
চরণ-তলে বিশাল মরু
বিগন্তে বিলীন।"

-দুরন্ত আশা [১৯০]

১৮৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৬৫

১৯০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

কবি ধিক্কার দিয়ে বলেন, বাঙালি জাতি যখন ঔপনিবেশিকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করছে না তখন এ দেশে না থেকে মরুর দেশে যেয়ে বেদুইনদের সাথে তাদের যাযাবরি জীবন যাপন অনেক উত্তম। কবি এসব ভীরু বাঙালিদের ধিক্কার দিয়ে সচেতন করার চেষ্টা করছেন এবং অলস ও উদাসীন জীবন পরিহার করে দেশের ভালোবাসায় সদা সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ জীবন যাপনে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছেন। কবি বলেন:

"হৃদয়- তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধা-হীন"

দুরন্ত আশা। [১৯১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি সমাজ সংসারের দুঃখ-কষ্ট খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি সকল মানুষের দুঃখে-দুঃখী ও ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে ব্যাপক সামাজিক মানবিকতাবোধ ছিল। এবং বিশ্বময় মানবিকতাবোধের চিত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পরিলক্ষিত হতো। দক্ষিণ আফ্রিকার 'মাটাবিলি' সম্প্রদায়ের ওপর ইংরেজ বণিকদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে কবি 'এবার ফিরাও মোরে' নামক কবিতাটি রচনা করেন। কবি ব্যথিত হৃদয়ে অত্যাচার ও নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বলিষ্ঠ লিখনীর মাধ্যমে। জীবন সংসারে নির্যাতিত মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন তিনি একজন সমাজের জনমানুষের কবি।

১৯১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

কবি বলেন:

কবি, তবে উঠে এসো- যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা- সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূণ্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।
এবার ফিরাও মোরে। [১৯২]

সমাজে বেঁচে থাকতে হলে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে। জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। সামাজিক অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে সংগ্রামী ও সাহসী হতে হবে। পূর্ণাঙ্গ অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। কোন অশুভ শক্তি যদি কারো অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তা প্রতিহত করতে হবে। কবি সমাজে বেচেঁ থাকার মৌলিক অধিকারসমূহ ফিরিয়ে দেওয়ার আহবান জানান তাঁর উপরোক্ত কবিতাটিতে। তিনি অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার সুব্যবস্থাসহ সাহস ও মুক্তির চেতনা নিয়ে সকলকে জাগ্রত থাকার আহবান জানান।

২। (ক) দেশের উন্নয়নে পরিশ্রমী, কর্মঠ, নির্লোভ ও অহিংস সমাজ বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণ:

ক) কবিকুল সম্রাট আহমাদ শাওকী কর্মীদের কর্মে কর্মঠ হওয়ার আহবান জানান তাঁর أيها العمال নামক কবিতায়। কবির ভাষায়

أيها العمال أفنوا العمر كدا و اكتسابا
و اعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يبابا

أيها العمال [১৯৩]

১৯২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১২৭

১৯৩। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ-শাওকিয়াত (১ম খণ্ড), পৃ. ১২৫

অনুবাদ: "হে কর্মীরা! পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং উপার্জনের প্রত্যাশায় জীবনকে কর্মে নিয়োজিত কর।
এবং পৃথিবীকে আবাদ কর। যদি (পৃথিবীর উর্বর জমি আবাদ না করা হয়) তবে পৃথিবী অনুর্বর হয়ে পড়বে।"

কবি কর্মীদের একনিষ্ঠভাবে ও আন্তরিকতার সাথে নিয়োজিত রাখার আহবান জানান। কবির ভাষ্যমতে, কর্মীরা যদি পরিশ্রমী না হয়। তারা যদি অনীহা ও অবহেলা করে তবে পৃথিবীর জমিসমূহ অনাবাদী হয়ে পড়বে। উর্বর জমি মরুময় হয়ে দেশের উৎপাদন হ্রাস পাবে, দেশ খাদ্য সংকটে পড়বে। এমতাস্থায়, কবি সকল কর্মীকে কাজের প্রতি মনোযোগী হয়ে কর্মীদের সর্বোচ্চ শ্রম ও কষ্ট করার আহবান জানান। তবেই দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে। নতুবা উৎপাদন হ্রাস পেলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। সুতরাং কর্মীদের সর্বোচ্চ পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করতে হবে। কর্মীদের পাখি ডাকা ভোরে আরাম আয়েশ ত্যাগ করে ঘর থেকে বের হতে হবে। এমনটিই আহবান জানান কবি তাঁর নিম্নোক্ত লাইনগুলোতে। কবি বলেন:

أيها الغادون كالنحل ارتيادا و طلابا
فى بكور الطير للرزق مجيئا و ذهابا
اطلبوا الحق برفق و اجعلوا الواهب دابا
و استقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا

أيها العمال [১৯৪]

অনুবাদ: "হে প্রভাতে বের হওয়া কর্মী! মৌমাছির ন্যায় জীবিকার সন্ধানে বের হও।
ভোরের পাখির ন্যায় যে জীবিকার সন্ধানে (খুব ভোরে) ঘর থেকে বের হয়।
তারা যথাযথভাবে জীবিকার সন্ধান করে এবং নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।
তাতে তারা অটুট থাকে ফলে মহান আল্লাহ তাদের জন্য উপার্জনের দ্বার একের পর এক উন্মোচন করে দেন।"

১৯৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

এখানে কবি একজন কর্মীর পরিশ্রম ও কষ্টের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, মৌমাছিরা খুব ভোরে মধুর সন্ধানে বের হয়। তারা মধু খোঁজার জন্য যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করে। এ কাজে তাদের ব্যাপক সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। ফলে সে খালি পেট নিয়ে ভোর বেলায় বের হয় আর পেট পুরো করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আসে। এসব ব্যবস্থা মহান আল্লাহ তাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে দিয়ে থাকেন। সুতরাং মানুষ অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের চেষ্টায় জীবিকার সন্ধানে বের হলে মহান আল্লাহ তাদের জীবিকার সন্ধান দিবেন বলে কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন অলস ও কর্মহীন জীবন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটা বোঝাস্বরূপ। কর্মহীন জীবন নৈরাশ্য ও বিষাদে ভরপুর। কবি 'ভৈরবী গান' [১৯৫] নামক কবিতায় কর্মহীন জীবনের হতাশার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

"ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশাকাহিনী।
সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে
হল না, কিছুই হবে না।"

ভৈরবী গান। [১৯৬]

কবির মতে, হতাশা কাটিয়ে আশার আলো ফুটাতে হলে অবশ্যই কাজের ব্যাপারে স্পৃহা ও উদ্যোগ থাকতে হবে। আমি পারব না, আমার দ্বারা হবে না এমনটি মনে করা ঠিক নয়। কেউ কাজ করতে চাইলে কাজের অভাব নেই, শুধু প্রয়োজন কাজ করার মানসিকতা থাকা। যেমন কবি বলেন:

"যদি কাজ নিতে হয় কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!
কাঁদে শিশিরবৃন্দ জগতের তৃষা
হরিতে!
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে।" -ভৈরবী গান। [১৯৭]

১৯৫। সঙ্গীতের এক প্রকার রাগের নাম। আবু ইসহাক ইভান, পৃ. ৩৫
১৯৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৯২
১৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

কর্মময় জীবন মানুষকে সুখী করতে পারে। সুতরাং সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন চাইলে গতিশীল কর্মময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হবে। কর্মহীন সমাজে অন্যায় ও অপরাধ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সমাজে অশান্তি, অস্থিরতা, মারামারি, হানাহানি, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি ব্যাপক আকার ধারণ করে। কর্মময় জীবনে প্রকৃত সফলতার ইঙ্গিত দিয়ে কবি বলেন:

ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

ভৈরবী গান। [১৯৮]

কবির মতে, কাজ কর্মে কষ্ট ও পরিশ্রম থাকলেও তাতে একটা আনন্দ আছে। সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন কর্ম করবে তখন সে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন হবেই। প্রচলিত একটা কথা আছে, 'যে জাতি যত পরিশ্রমি সে জাতি ততো উন্নত।' সুতরাং কর্মঠ মানুষদের জীবনই সুন্দর ও সুখকর হয়। সমাজ জীবনের মানুষদের বিরামহীন কর্মচর্চা ও কর্মব্যস্ততা কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। সমাজ জীবনের প্রতিদিনের কর্মব্যস্থতার চিত্র কবি তুলে ধরেছেন তাঁর 'নগর সংগীত' কবিতায়। কর্মই পারে একটি মানুষকে দীর্ঘ সুখ ও সমৃদ্ধি দিতে। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সহায়তা করতে। মানব সমাজের দৈনন্দিন জীবন যাপনের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো কর্ম। কথায় আছে 'কর্মহীন মস্কিষ্ক শয়তানের আস্তানা'। সমাজের মানুষদের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দম সকলকে বিমোহিত ও বিমুগ্ধ করে। কবি বলেন:

নব নব ক্ষুধা নূতন তৃষ্ণা, নিত্যনূতন কর্মনিষ্ঠা-
জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল কুটিল চলেছে পন্থ, নাহি তার আদি, নাহিকো অন্ত-
উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত সিন্ধু-শৈল -সরিতে।

নগর সংগীত [১৯৯]

১৯৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
১৯৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃ. ১৪০

মানুষকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর জীবন যাপন করতে হলে সবার আগে তাকে কর্মঠ মানুষ হতে হবে। মানুষের কর্মের স্পৃহা থাকলে কোন প্রতিবন্ধকতা তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। কবির ভাষায়, কর্মনিষ্ঠতা অসাধ্যকে সাধ্য, অবাধ্যকে বাধ্য এবং অশান্তকে শান্ত করতে পারে। কবি বলেন:

হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য-
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য তাহারে ধীরব সবলে।
নগর সংগীত। [২০০]

কবি কর্মকে একটি বিজয়ের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে দেখছেন। কর্মস্পৃহা মানুষের মাঝে জাগ্রত হলে সকল প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিরোধ, অসাধ্যকে সাধন করার মানসিক শক্তি তৈরী হয়। কবি বিজয় বাদ্য বাজিয়ে সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করার মানসিক শক্তি অর্জনের বর্ণনা দিয়েছেন উপরোক্ত লাইনগুলোতে।

মানুষ কর্মনিষ্ঠ ও কর্মমুখী হলে সমাজের অগ্রগতি দ্রুত সম্ভব হয়। সমাজের মানুষদের দারিদ্রতা ও অসহায়ত্ব থাকতে পারে না। তখন মানুষগুলো হয়ে ওঠে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বি। সে সমাজের অর্থনৈতিক দৈন্যতা দূর হয়, শান্তি নেমে আসে। কবির ভাষায়:

পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা- আনিব তোমারে বাঁধিয়া।
-নগর সংগীত। [২০১]

সমাজের মানুষগুলো কর্মমুখর হলে সে সমাজের মানুষদের ভিক্ষাবৃত্তির মত নিলর্জ্জ কর্মকাণ্ডের সম্মূখিন হতে হয় না। সে পরনির্ভরশীল মানসিকতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। টাকা উপার্জনের জন্য পূজার মাধ্যম ছাড়াও অন্যান্য পথ খোলা থাকে।

২০০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
২০১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

সমাজ ও রাষ্ট্রকে বড় করতে হলে সকল কাজের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদান আবশ্যক। বিশ্বকবি তারই বার্তা দিয়েছেন 'দেশের উন্নতি' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

'ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়'
এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ ব'লে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।
'পরের কাছে হইব বড়ো'
এ কথা গিয়ে ভুলে
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণমূলে। -দেশের উন্নতি। [২০২]

কবির মতে, কাজ কাজই। কোন কাজকে খাঁটো করে দেখার সুযোগ নেই। আবার কোন কাজকে বিশাল বা সাধ্যের বাহিরে ভাবার জোঁ নেই। কাজের মাধ্যমেই সকলকে বড় হতে হবে। আমি নিজে বড় ও পারদর্শী এ কথা প্রচার করতে হয় না। কাজই মানুষকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করে। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজের বিকল্প নেই। পরের কাজে আমরা বড় হবো; এ কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। নিজস্ব কর্মতৎপরতা, পারদর্শীতা ও প্রাণশক্তি দিয়েই বড় হতে হবে। সমাজের মানুষগুলো কর্ম দিয়ে বড় হলে দেশও বড় হবে। দেশের উন্নয়ন হবে। দেশ এগিয়ে যাবে। কবির ভাষ্যমতে, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের পূর্বশর্ত সে রাষ্ট্রের সকল স্তরের মানুষদের অধিক পরিশ্রমী, কর্মঠ ও উদ্যোগী হওয়া। কবির বলেন:

সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে-
মরণভয় চরণতলে
দলিত হয়ে রবে।
দেশের উন্নতি। [২০৩]

২০২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৬৮-৬৯
২০৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

কবি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে বড় হবার আহবান জানিয়েছেন। এখানে বড় বলতে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নত স্বভাব-চরিত্র ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বিষয় আলোকপাত করছেন। সমাজের মানুষগুলো যখন শিক্ষা-দীক্ষায়, উন্নত স্বভাব চরিত্রে বড় হবে তখন সমাজ বড় হবেই। সৎ পথে এবং সততার সাথে কাজ করলে দেশ বড় হবে এটাই কবির বিশ্বাস। মাথা উঁচু করে মরনভয় উপেক্ষা করে কাজ করতে হবে। তবেই সমাজ ও দেশের উন্নয়ন হবে।

কবি সবাইকে সত্য ও সুন্দরের পথে চলার আহবান জানান। এ পথে অনেক বাধা-বিপত্তি আসতে পারে, এমনকি মৃত্যুও, সবকিছু পদদলিত করে সর্বদা সত্যের পথে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। সৎ পথে থাকলেই সমাজের মানুষেরা মুক্তি পাবে এবং সফল ও সার্থক জীবন যাপন করতে পারবে। দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর দেশের স্বার্থে কাজ করার আহবান জানিয়ে কবি বলেন:

করিব আমি সবার সাথে
দেশের উপকার।
বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির,
অসংশয়ে করিব স্থির
মোদের বড়ো এ পৃথিবার
কেহই নহে আর!

দেশের উন্নতি [২০৪]

একজন নিস্বার্থ দেশ প্রেমিকের ভাবনা ফুটে উঠেছে উপরোক্ত লাইনগুলোতে। একজন দেশ প্রেমিক সর্বদা দেশের কল্যাণে কাজ করবে। দেশের স্বার্থকে সবার উর্ধ্বে দেখবে। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিবে। দেশের মানুষদের পাশে থাকবে। সমাজের মানুষদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিদ্রুপ ও সমালোচনা পরিহার করে তাদের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করে সমাজ সংসার পরিচালনার আহবান জানান কবি।

২০৪। প্রাগুক্ত, পৃ নং ৬৯

তিনি বলেন:

'যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই-
কেন হীন ষৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রুপ কেন ভাই!' নিন্দুকের প্রতি নিবেদন। [২০৫]

মৃত্যুর ভয়ে আলস্য ও কর্মহীন জীবন কবির কাছে অপছন্দের। কবির ভাষ্য মতে, 'জন্মিলে মরিতে হয়' এ মহা সত্যকে উপলব্দি করে বৈরাগ্যবাদ ও দুনিয়া বিমুখ জীবন পরিহার করতে হবে। কবির ভাষায়:

" সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে
আবেশবশে।" ঝুলন। [২০৬]

জীবনকে সফল, সার্থক ও সুন্দর করতে মৃত্যু ভয়ে ভীত হলে চলবে না। মরণখেলায় নিজেকে অবর্তীণ করতে হবে। সফল হতে হলে মৃত্যু ঝুঁকি থাকবে। তাই, অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে বসে থাকা মোটেও ঠিক নয়। কবির প্রত্যাশা, সমাজ জীবনে সবাই কর্মঠ, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী এবং নির্ভীক হলে সে সমাজের উন্নতি আসবেই।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুরু গোবিন্দ' কবিতাটি ইতিহাস বিষয়ক একটি কবিতা। এ কবিতার মাধ্যমে কবি সমাজের মানুষগুলোকে ধৈর্য্যশীল, পরিশ্রমী, ও সংগ্রামমুখর হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন:

"কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব-
পেয়েছি আমার শেষ!
.....
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ'। "-গুরু গোবিন্দ। [২০৭]

এ কবিতায় কবি সমাজ উন্নয়নে সমাজের মানুষগুলোকে ধৈর্যশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে এবং যোগ্যনেতৃত্ব ও নৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর আহবান জানায়। কবি লোভ-মোহমুক্ত জীবন যাপনে সমাজের মানুষদের আহবান জানিয়ে রচনা করেন 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটি।

২০৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৭৯
২০৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ৬৮
২০৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৮৬

উক্ত কবিতায় কবি বলেন:

'এখনো উঠাতে পারি' কররজোড়ে যাচে,
যদি দেখাইয়া দাও কোনখানে আছে।'
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, ' আছে ওই নদীতলে'।"

-নিষ্ফল উপহার। [২০৮]

সমাজ সংসারে সফল হতে কবির এ আদর্শিক বার্তা সকলকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। যার লোভ-মোহ আছে তার ধ্বংস অনিবার্য। কথায় বলে 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'। লোভ-মোহ থাকলে সমাজে অন্যায় অপরাধ বেড়ে যায়। এতে সমাজ-সংসারের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। সুতরাং একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে মোহমুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হবে।

হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ আমাদের সমাজ জীবনকে কলুষিত করে ফেলছে। এতে সমাজের মানুষগুলো স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। এর ফলে সমাজ-সংসারের স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হচ্ছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা কমে যাচ্ছে। একটি গতিশীল ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা একটি উন্নতরাষ্ট্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। যার জন্য প্রয়োজন সমাজের মানুষগুলোর মাঝে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিহার করে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রেম-ভালোবাসা ও মায়া-মমতা দিয়ে সমাজকে জয় করার আহবান জানান রবীন্দ্রনাথ। কবি বলেন:

সবাই আপন কাজে ধায়
পাশে কেহ ফিরিয়া না চায়।

-কবির প্রতি নিবেদন। [২০৯]

আমি শুধু আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। চারপাশের মানুষদের খোঁজ খবর রাখতে হবে। এটাই সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। সমাজের শত্রুদের বন্ধু বানিয়ে নিতে হবে এবং

২০৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
২০৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। তারই দৃষ্টান্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমালোচকদের 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করে প্রমাণ করলেন তাঁর 'পরিত্যক্ত' কবিতায়। কবি বলেন:

'বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখর গুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি? পরিত্যক্ত। [২১০]

কবির মতে, শত্রুকে বন্ধু বলে কাছে নিয়ে আসতে হবে। তবেই সমাজে শত্রুতা ও বিশৃঙ্খলা কমে যাবে। ফলে একটি আদর্শ ও সুন্দর সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে।

কবির কাব্য ভাবনায় হঠাৎ ছেদ পড়লো, মনে হলো তিনি খুবই বিষন্নতায় ভুগছেন। কারণ আগের মতো কাব্য প্রেরণা তিনি পাচ্ছেন না। তাই বলে তিনি বসে নেই। তিনি ভাবছেন নতুন জীবনবোধ নিয়ে। আগামীর পথ চলা নিয়ে যদিও তা অমসৃণ। এরপরও কবি এ নতুন জীবনাহবানে সাড়া দিয়ে এ পথে চলতে প্রস্তুত। তাঁর মতে, জীবন সবসময়তো আর একভাবে যাবে না? চলার পথে বাধা, প্রতিবন্ধকতা আসতেই পারে। তাই বলে বসে থাকার কোন উপায় নেই। নতুন প্রাণচঞ্চলতায় নিজেকে উজ্জীবিত করে আগামীর পথে চলার প্রচেষ্টা থাকতে হবে। কবির ভাষায়:

'ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন;
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন;
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
ঊষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা–
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।'

-দুঃসময়। [২১১]

২১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
২১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চায়িতা, পৃ. ১৭০

কবির দর্শন হলো, সমাজে সকল কাজে আমরা সফল হবো তা ভাবা ঠিক নয়। তবুও কাজ চালিয়ে যেতে হবে একনিষ্ঠভাবে। তবে সাফল্য আসবে। মানুষের এ সমাজ সংসার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ তিন কালের সমষ্টি। কবির মতে, মানুষের অতীত যতই সাফল্যমণ্ডিত ও সুখকর হোন না কেন মানুষের হতাশা, ও গ্লানি তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। অতএব, বর্তমান কালকেই জীবন যাত্রায় অন্যতম কাল হিসেবে ধরে নিতে হবে। জীবনের সাফল্য ও সুখ-সমৃদ্ধি বর্তমানকে সামনে রেখে তৈরী করতে হবে। কারণ এটি জীবন ভোগের ও আনন্দ -উৎসব করার অন্যতম সময়। সুতরাং তিনি মানুষদের সঠিক ও সুন্দর জীবন যাপনে বর্তমানকেই বেশী গুরুত্ব দেয়ার আহবান জানিয়েছেন তাঁর 'উদবোধন' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, ফুটে আর টুটে পলকে–
তাহাদেরই গান গা রে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।।

-উদবোধন। [২১২]

অতীত ও ভবিষ্যতের বিষয়ের প্রতি চিন্তিত না হয়ে রবীন্দ্রনাথ বর্তমানকে ভালোভাবে কাজে লাগানোর নির্দেশনা প্রদান করেন নিম্নের লাইনগুলোতে। কবির ভাষায়:

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি-ওরে, থাক্ থাক্ কাঁদনি।।

-উদবোধন। [২১৩]

অনাগত সাফল্যের প্রত্যাশায় বর্তমান জীবনের সকল আনন্দকে সাদরে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন কবি তাঁর 'অনবসর' ও 'উদাসীন' কবিতায়। কবি বলেন:

'প্রিয়ে, তোমরা সবাই জানো
ধরণীর নাম মর্তভূমি-

২১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, পৃ. ২৩
২১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

যে যায় চলে বিরাগ-ভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই এমন
সময় যে নেই, সময় যে নেই।' অনবসর। [২১৪]

কবি আরো বলেন:

'বুক-ভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া;
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ উঠেছি।' উদাসীন। [২১৫]

মানুষের জীবনে আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আশা পূরণ হলে সে খুশি হয়। আর আশা ভঙ্গ হলে হতাশ হয়, দুঃখ পায়। কবির মতে, মানুষ এসব করে বর্তমানের সুখ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং অতীতের দুশ্চিন্তা ও গ্লানি অন্তর থেকে মুছে ফেলে দিয়ে বর্তমানের আনন্দময় জীবন যাপনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কবি বলেন:

'থাকব না ভাই, থাকব না কেই-
থাকবে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।।' শেষ। [২১৬]

অতীতের সকল অপ্রাপ্তি মুছে ফেলে বর্তমানের সহজ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার আহবান জানান কবি। তিনি বর্তমানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শিখিয়েছেন। কবির মতে, বর্তমানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখলে মানুষ বেশী লাভবান হয়। বর্তমানকে ঘিরে জীবনে সফল হওয়ার বর্ণনাই কবি 'সেকাল' কবিতার প্রধান উপজীব্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

কবি বলেন:

'মরব না, ভাই নিপুণিকা–
চতুরিকার শোকে–
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্তলোকে।
আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে–
কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে।' সেকাল। [২১৭]

২১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
২১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮
২১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

বর্তমান কালের সুখ-শান্তি ও আনন্দ যারা উপেক্ষা করতে চান, নিজেদের সর্বদা আনন্দময় জীবন থেকে গুটিয়ে রাখতে চান, তাদের সমালোচনা করে কবি রচনা করেন 'যথাস্থানে' কবিতাটি। কবি বলেন:

'যেথায় সুখে তরুণ-যুগল পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল হয়ে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়,
পাখি তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায় পুষ্প লতা পাতা;
সেইখানেতে সরল হাসি সজল চোখের কাছে
বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে যেতে কি সাধ আছে?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া কহে আমার গান–
'সেইখানে মোর স্থান। যথাস্থান। [২১৮]

জীবনের সমস্ত সুখ ও আনন্দ গ্রহণে তিনি সকলকে আহবান জানান। এতে কেউ ভর্ৎসনা করলেও তাতে কিছু যায় আসে না। তারই বর্ণনা দিয়ে তিনি রচনা করেন 'ক্ষতিপূরণ' কবিতাটি। কবি বলেন:

"মরার পরে চাই নে ওরে
অমর হতে।
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।" ক্ষতিপূরণ। [২১৯]

কবি মরনের পরে কৃতিত্ব চান না, কৃতিত্ব পৃথিবীতে দেখে যেতে যান। এ ধরনের বর্ণনাই পাওয়া যায় তাঁর 'ক্ষতিপূরণ' কবিতায়।

২১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

পঞ্চম অধ্যায়

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজচিন্তা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ তাদের উভয়ের কবিতায় সমাজচিন্তা বিষয়ক বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। তারা সমাজের মানুষদের নিয়ে সর্বত্র চিন্তা করেছেন। সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে তারা ভেবেছেন এবং সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাব্যিক ছন্দে চেষ্টা করেছেন। উভয় কবি সমাজের ভালো-মন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুঃখ-দুর্দশা, সুখ-সমৃদ্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির বাস্তব চিত্র কাব্যিক চিন্তায় উপস্থাপন করেছেন। সমাজ অগ্রগতি ও উন্নয়ন বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা পাঠক মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। বঞ্চিত ও নির্যাতিত নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেমন তাঁরা উভয় ছিলেন সোচ্ছার। তেমনি সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত সমাজের অসহায় মানুষগুলোর পক্ষে তাদের কবিতাসমূহ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সমাজের শিক্ষা উন্নয়ন, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা, ধর্মীয় অনুশাসন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে এক অনন্য উদাহরণ হলো শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলি। শীত, বর্ষা ও গ্রীষ্মে প্রকৃতির যে পরিবর্তন এবং প্রকৃতির সাথে সমাজের যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা উভয়ে ফুটিয়ে তোলেন তাদের স্ব স্ব কাব্যিক অঙ্গনে। প্রকৃতির প্রভাবে সমাজে বসবাসরত মানুষদের আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ইত্যাদি বৈচিত্রময় ছন্দ বিন্যাস তাদের কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ঋতুরাজ বসন্তে প্রকৃতির যে চমৎকার সৌন্দর্য সূচিত হয় তার কাব্যিক বর্ণনা উভয়ের কবিতায় বিশেষ স্থান পেয়েছে। এসময় বিস্তৃর্ণ সবুজের মেলা ও নির্মল আবহাওয়া সকলকে প্রফুল্ল ও উজ্জীবিত রাখে। জীব ও জড় জগতের মধ্যকার প্রকৃতির যে অদৃশ্য শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় তা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন উভয়ে। সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় নির্দেশনা অনুসরণেও গুরুত্বারোপ করেন শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ। তবে তারা ধর্মাজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা ও বৈরাগ্যবাদ পরিহারে বিশেষভাবে আহবান জানান। পৃথিবী এক অস্থায়ী আবাস। এখান থেকে সকলকে বিদায় নিতেই হবে। এ পরম সত্যকে উপলব্দি করার জন্য তারা সমাজের মৃত্যু বিষয় উদাসীন মানুষদের সচেতন করেন। আহমাদ শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ চিন্তায় প্রাসঙ্গিক ভাবনার কাব্যিক চিত্র অত্র অধ্যায় আলোকপাত করা হবে।

১ম পরিচ্ছেদ

বাস্তব সমাজ চিত্রের বর্ণনা

ক) আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি নারী শিক্ষা, বিবাহ এবং পর্দা বিষয়ে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। নারীর সকল বৈষম্য দূর করে সমতা ও স্বাধীনতা বিধান করেন। তিনিই সর্বপ্রথম টাকার বিনিময়ে মেয়েদের বৃদ্ধদের সাথে বিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে কাব্যিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। কবি তাঁর عبث المشيب কবিতায় এতদ প্রসঙ্গে বলেন:

المال حلل كل غير محلل حتى زواج الشيب بالابكار

ما زوجت تلك الفتاة و انما بيع الصبا و الحسن بالدينا

عبث المشيب [২২০]

অনুবাদ: "প্রত্যেক অবৈধ উপার্জনকারী তার উপার্জিত সম্পদ বৈধ মনে করে। এমনকি বার্ধক্যে (অর্থের বিনিময়) বিয়ে করার বিষয়টিও।
এ যুবতির (বৃদ্ধের সাথে) বিয়ে যেন তার তারুণ্য ও সৌন্দর্য দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করা।"

সমাজের কিছু অর্থলোভী মানুষ, যারা অর্থের বিনিময়ে যে কোনো অবৈধ ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। এমনকি নিজের কন্যা সন্তানকেও বৃদ্ধের কাছে বিয়ে দিতে রাজী হয়ে যায়। এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে কবি সামাজিক অপকর্ম হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এ ধরনের কার্যক্রম গ্রাম বা শহরে সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কবি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করেন। গ্রাম ও শহরের মানুষদের সমাজের সকল অন্যায়-অপরাধ, অবিচার-অনাচার, অত্যাচার-নির্যাতন দূরীকরণে এক জোরালো কাব্যিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি সমাজকে পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠান করতে চান।

কবি শাওকী সমাজের শিক্ষা উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। তিনি গ্রাম ও শহরের প্রতিটি পরিবারে শিক্ষার আলো জ্বালাতে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর বিশ্বাস দেশ ও দেশের জনগোষ্ঠীর জীবন মানোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সুশিক্ষার বিকল্প নেই।

২২০। আহমাদ শাওকী, দিয়ানু আশ শাওকিয়াত (১ম খণ্ড), পৃ. ১৭৬

শাওকী একটি সুখী ও শান্তিময় সমাজ গঠনে গ্রাম অথবা শহরে বসবাসরত মানুষদের পারস্পরিক সকল বিরোধ নিরসন করে ঐক্যবদ্ধভাবে ও পারস্পরিক সহনশীলতার সাথে বসবাসের আহবান জানান। কবি বলেন:

الا الخلف بينكم؟ الا ما؟ و هذه الضجة الكبرى علاما؟

و فيم يكيد بعضكم لبعض و تبدون العدوة والخصاما

****

و لينا لا مر حزبا بعد حزب فلم نك مصلحين و لا كراما

شهيد الحق [২২১]

অনুবাদ: নিজেদের মধ্যে এই বিরোধ আর কতদিন? কিসের জন্য এই বিরাট কোলাহল?

একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের ষড়যন্ত্র কেন? কেনইবা প্রকাশ করছে বৈরিতা আর বিরোধ?

এক দলের পর আরেক দল আমরা ক্ষমতায় এসেছি, কিন্তু কোন কল্যাণ করিনি। আসলে আমরা উদার নই।

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন সামাজিক মানুষ। তিনি সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সংগতি-অসংগতি সহজে উপলব্দি করতে পারেন বলেই সমাজে একত্রিত হয়ে বসবাসের গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। কবির দৃষ্টিতে, সমাজে একে অপরের প্রতি শত্রুতা ও বিভেদ সৃষ্টির মধ্যে কোন কল্যাণ বা উপকারিতা নেই। বরং একত্রিত হয়ে বসবাসের মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত। তিনি বাঙালির সমাজ বাস্তবতা গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন এবং কবিতার মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বধূ' নামক কবিতায় পল্লী সমাজের আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা অবুঝ মেয়েটির মনের কথা অতি করুণভাবে চিত্রিত করেছেন। পল্লী সমাজের জীবন যাত্রার সাথে শহুরে জীবনের সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরুপনের চেষ্টা করেছেন। গ্রামীণ পরিবেশে বড় হওয়া মেয়েটি শহরে

২২১। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ শাওকিয়াত (১ম খণ্ড), পৃ. ৩০৩, ৩০৪

বসবাসরত এক পরিবারে বধূ এসেছে। তার কাছে শহরের জীবনটা প্রাণহীন মনে হয়েছে। গ্রামের সে সাজানো-গোছানো প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সহজ-সরল মানুষগুলোর কথা তার বারবার মনে পড়ছে। তার কাছে মনে হয় শহরের মানুষগুলো আবেগহীন ও আত্মকেন্দ্রিক। তাদের মধ্যে মায়া-মমতা, ভালোবাসা, আদর সোহাগ আর স্নেহের বড়ই অভাব। তাই বধূটি শহরে যাওয়ার পরও গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার কথা কোন ভাবেই ভুলতে পারছেনা। গ্রামের খোলা মাঠ, পাখিদের কলরব, আঁকাবাকা মেঠো পথ, ছায়া ঘেরা বৃক্ষলতা এবং সন্ধ্যার পূর্বে কলসী কাঁধে নিয়ে পথচলা গ্রামীণ মেয়েদের দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি গ্রামের সমাজ চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন। কবি বলেন:

কলসী লয়ে কাঁধে পথ সে বাঁকা
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধু ধু,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায় শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁজের আলো ঝলে,
দু ধারে ঘন ঘন ছায়ায় ঢাকা। বধূ [২২২]

গ্রামের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আরো বলেন:

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়াবে ঘেঁষে।

****

গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে।
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি। বধূ [২২৩]

২২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী পৃ. ৫৬
২২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

কবি গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত একজন গৃহবধূর শহরের চার দেয়ালের বন্দী জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

'হায়রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখির গান কই, বনের ছায়া! বধূ [২২৪]

কবির মতে, শহুরে জীবনে কোথাও প্রশস্ত মাঠ নেই। নেই এলোমেলো পথঘাট, ছায়া ঢাকা গাছপালা এবং পাখিদের গুঞ্জরণ। পক্ষান্তরে গ্রামীণ জীবন আকাশে উড়ন্ত পাখির মতো। এ জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসা ও খেলাধূলার উপযুক্ত পরিবেশের বড়ই অভাব। তারই বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেন:

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা!
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট-
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা। বধূ [২২৫]

কবিতায় কবি গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন।

গ্রাম বাংলার বাস্তব সমাজ চিত্র বর্ণনা করেছেন কবি তাঁর 'বসুন্ধরা' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

"একখানি গ্রাম; তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরি মধ্য পথে
সংকীর্ণ নদীটি চলি আসে কোনোমতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া" বসুন্ধরা [২২৬]

২২৪। প্রাগুক্ত পৃ. ৫৬
২২৫। প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭
২২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ৯৫

গ্রামের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের দৃশ্য বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি গ্রামের আঁকা বাঁকা মেঠো পথ, ছোট ছোট নদী, জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য কবিতায় চিত্রিত করেছেন সুনিপুণভাবে। কবি আরো বলেন:

"কঠিন পাষাণ ক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান।
দুর্দম স্বাধীনতা; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী- মাঝে বৌদ্ধ মঠে।
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপাড়া পারশিক
গোলাপ কাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান।"

-বসুন্ধরা। [২২৭]

গোটা বিশ্ব যেন একটি সমাজ। যেখানে বিপুল জনগোষ্ঠী বসবাস করে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈচিত্রময় সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন, আরববাসী উটের দুধ পান করে। তারা মরুদ্যানে বসবাস করে। তিব্বতিরা পাহাড়ী পরিবেশে বেড়ে ওঠে। তাতার জাতি অশ্ব চালাতে দক্ষ ও নির্ভীক। নম্রতা ও ভদ্রতায় সেরা জাতি জাপানিরা এবং প্রাচীন সকল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হলো চীনা জাতিগোষ্ঠী। কবি আরো বলেন:

এই-সব তরুলতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এই জীবন পরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন সমাজ।

-বসুন্ধরা। [২২৮]

২২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২২৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

কবি প্রকৃতির গোছানো জীবন প্রবাহ দেখে বিমোহিত হচ্ছেন। বহমান নদ-নদী, বনের বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল প্রভৃতির শৃঙ্খলা দেখে উপলব্দি করেন যে, প্রকৃতির প্রতিটি জীব ও জড় জগতের মাঝে একটি অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে। আর সে বন্ধন হলো সামাজিক বন্ধন। সামাজিক এ বন্ধনের ফলে প্রকৃতি এতটা সুন্দর, গোঁছালো ও সুশৃঙ্খল। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ এ জগতের সকল জীবের মধ্যে এ বন্ধন সৃষ্টি করে এ বিশ্বকে বাসযোগ্য করে তুলেছেন। আমরা মানুষ জাতি সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করি বলে সামাজিক জীব। কবির দৃষ্টিতে সামাজিক জীব শুধু মানুষ নয় এ পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টজীব। সৃষ্টিজীবের পারস্পরিক বন্ধন আর শৃঙ্খলা অবলোকন করে কবি বলেন: এ বন্ধন অদৃশ্য গাঁথুনির মাধ্যমে গড়া। যেমন, আমরা যদি পিঁপীলিকার দিকে লক্ষ্য করি দেখতে পাই পিঁপীলিকা সারিবদ্ধ ও দলবদ্ধ হয়ে চলাচল করে। তারা বসবাসও করে একসাথে। এভাবে পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টজীব সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে।

কবি এসব সুশৃঙ্খলার রহস্য খোঁজার চেষ্টা করে উপলব্দি করেন প্রকৃতির এ সমাজবদ্ধতা একজনের সংকেতে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন মহান সৃষ্টিকর্তা। বিশ্ব জগতের স্রষ্টা। তাঁর নির্দেশে বিশ্ব প্রকৃতি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

কবি বলেন:

"বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক বিশ্ববাজনা!
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্তৃত হয়ে আপনা।"

বিশ্বনৃত্য। [২২৯]

২২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০

কবির ভাবনা হলো, আকাশ থেকে একজন বাঁশি বাজাচ্ছেন। আর সে বাঁশির সুরে সকল সৃষ্টজীব নৃত্য করে চলছে। বিশ্বে নৃত্যময় পরিবেশ অবলোকন করে কবি নিজেও বিস্মিত ও অভিভূত। কবির চিন্তা, এ জগৎ সংসারের একজন দেবতা আছেন। যিনি এসবের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। এ দেবতা হলো জীবনের অনুপ্রেরণাদানকারী। কবি বলেন:

গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিয়ে নাচিয়া চিরচঞ্চল

.....

ওগো, কে বাজায়, কে শুনিতে পায়,
না জানি কী মহা রাগিনী!
দুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী

.....

টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা।

বিশ্বনৃত্য [২৩০]

২৩০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭২

২য় পরিচ্ছেদ

সমাজ প্রকৃতির বর্ণনায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ

ক) মহান স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয়। প্রকৃতির এ চির সত্যকে গভীরভাবে উপলব্দি করেছেন মিসরের কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকৃতি আর সমাজের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সমাজের মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদির চর্চা অনেকটা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির এ প্রভাবের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমাজে বসবাসরত মানুষগুলোর চিন্তা-চেতনা ও আচার- আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ উভয় স্ব স্ব দেশের মানুষগুলোর প্রকৃতির সাথে তাদের সমাজ ব্যবস্থার যে গভীর মিল বিদ্যমান তা অবলোকন করেছেন। তাই তারা প্রকৃতিকে উপজীব্য করে রচনা করেছেন সমাজ ও প্রকৃতি বিষয়ক বিভিন্ন কবিতা।

ক) ঋতুরাজ বসন্তে প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে শাওকী রচনা করে الربيع و وادي النيل নামক কবিতাটি। বসন্তে সমাজ প্রকৃতির যে বিশাল পরিবর্তন হয় তা কবি ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন। এ কবিতার মাধ্যমে কবি বসন্তকালে পাখিদের কলরব, প্রকৃতিতে ফুল ও ফলের সৌন্দর্য, আকাশ, সূর্য ও পানির বৈচিত্রময় দৃশ্য এবং নির্মল আবহাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। কবি বলেন:

آذار أقبل، قم بنا يا صاح حتى الربيع حديقة الأرواح
اجمع ندامى الظرف تحت لوائه وانشر بساحته بساط الراح
صفو اتيح فخذ لنفسك قسطها فالصفو ليس على المدى بمتاح

الربيع و وادي النيل [২৩১]

অনুবাদ: "হে আমার বন্ধুরা! জেগে ওঠো। মার্চ মাসের সূচনা বসন্তের আগমনের সুবাতাস বইছে। বসন্ত বাগানের (গাছপালার মাঝে নতুন করে) প্রাণ এনেছে।

সকল দুঃখ-কষ্টকে আজ (বসন্তের) পতাকা তলে জড়ো কর এবং (সকল দুঃখ-কষ্টকে) ব্যাপক প্রফুল্লতায় তাঁর (বসন্তের) অঙ্গনে ছড়িয়ে দাও।

২৩১। আহমাদ শাওকী, দিয়ানু আশ শাওকিয়াত (২য় খণ্ড), পৃ. ৪১০, ৪১১

(বসন্তের আগমনে পৃথিবীতে যেন) পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতা এসেছে। সুতরাং তুমি (বসন্তের নির্মলতায়) অংশ গ্রহণ কর। বসন্তের এ নির্মলতা যুগের শৃঙ্গলে আবদ্ধ নয়।"

কবির মতে, বসন্তের আগমনে পৃথিবীর সকল প্রাণির আত্মায় যেন নতুন করে প্রাণ সঞ্চারিত হলো। সকলে যেন এক অদৃশ্য আনন্দের বার্তায় আন্দোলিত হলো। বসন্তের আগমনে বাগান পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়। যা সমাজে বসবাসরত মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। বসন্তকালে সমাজ প্রকৃতিতে যে চমৎকার পরিবর্তন সূচিত হয় সে কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি বলেন:

ملك النبات فكل أرض داره تلقاه بالأعراس و الأفراح
منشورة أعلامه، من أحمر قان، و أبيض فى الربى لماح
لبست لمقدمه الخمائل و شيها و مرحى فى كنف له و جناح
الربيع و وادي النيل [২৩২]

অনুবাদ: "উদ্ভিদরাজীর মালিক! বসন্তের আগমনে পৃথিবীর সর্বত্র সবুজ-শ্যামলে এবং প্রফুল্লে বিস্তৃত।

বসন্তের প্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে উদ্ভিদরাজী অতি রক্তিম অথবা অতি সাদা বর্ণের ফুলে ও ফলে ভরপুর থাকে।

বসন্তের আগমনে বাগানে ভিন্ন রূপ ধারণ করে গাছ-গাছালির ডালপালাসমূহ ফুল ও ফলে সুসজ্জিত হয়ে আছে।"

الورد فى سرر الغصون مفتح متقابل يثنى على الفتاح
ضاحى المواكب فى الرياض، مميز دون الزهور بشوكة و سلاح
الربيع و وادي النيل [২৩৩]

অনুবাদ: "গাছের ডালায় ফুটন্ত গোলাপের সৌন্দর্যে মনে হয় গাছের এ ফুল স্রষ্টার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছে।

২৩২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১
২৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

গোলাপগুলো বাগানে শোভাযাত্রা গমনকারী দলের ন্যায় সুবিন্যস্ত। ফুলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এটি কণ্টকমুক্ত।" কবি আরো বলেন:

و ترى الفضاء كحائط من مرمر نضدت عليه بدائع الألواح
الغيم فيه كالنعام: بدينة بركت، و أخرى حلقت بجناح
و الشمس أبهى من عروس برقعت يوم الزفاف بعسجد وضاح
الربيع و وادي النيل [২৩৪]

অনুবাদ: "দেখবে বসন্তের আগমনে মহাশূন্য যেন মর্মর পাথরের ন্যায় স্বচ্ছতা দ্বারা বেষ্টিত। যা অপরূপ রঙে সুবিন্যস্ত।

তথায় মেঘমালা উটপাখির ন্যায় উচুঁ উচুঁ। তা নাড়া চাড়ায় ভারী ও স্থূলকায় এবং দ্রুত গতিতে ধাবমানের দিক থেকে অতি হালকা।

বিবাহোৎসবে সুদর্শন সোনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া নববধূর ন্যায় বসন্তের সূর্য অতি সুদর্শন।"

বসন্তের আগমন কে যৌবনকালের ক্ষিপ্রতার সাথে তুলনা করতে গিয়ে কবি বলেন:

إنى لأذكر بالربيع و حسنه عهد الشباب و طرفه الممراح
هل كان إلا زهرة كزهوره عجل الفناء لها بغير جناح ؟
الربيع و وادي النيل [২৩৫]

অনুবাদ: "বসন্তের সৌন্দর্য দেখে আমার যৌবন কালের কথা মনে পড়ছে। তখনকার উৎসাহ, উদ্দিপনা ও উল্লাস উন্নত জাতের ঘোড়ার ক্ষিপ্রতার ন্যায় ছিল প্রাণবন্ত।

সে সময়টা ছিল বসন্তের ফুটন্ত ফুলের ন্যায় পুত-পবিত্র ও অনেক প্রাণবন্ত।"

কবির ভাষ্যমতে, বসন্তের মনোরম সৌন্দর্য যেন যৌবনকালের শক্তি সামর্থ্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার ন্যায় প্রাণবন্ত । সে সময়ের যৌবনকাল পুত-পবিত্রতার দিক থেকে যেন বসন্তের ফুটন্ত ফুল।

২৩৪। প্রাগুক্ত পৃ. ৪১২
২৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

খ) আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে বাঙালি সমাজের মানুষগুলোর একটি বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। বাঙালী সমাজ তার পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিবেশের রুদ্র ছাঁয়া তাকে ব্যাথিত করে আবার সুজলা শুফলা শস্য-শ্যামলা তাকে আন্দোলিত করে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেমন তাকে কষ্ট দেয় আবার বৃষ্টি শেষে রংধুনু তার হৃদয়ে প্রফুল্লতা দান করে। এ সব কবি তাঁর কল্পনার ডানা মেলে কবিতায় ফুটিয়ে তোলেছেন। কবি বলেন:

'আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।' একাল ও সেকাল। [২৩৬]

কবি বর্ষার দিনের সাথে সমাজের মানুষের এক বিশেষ মিল উপলব্দি করেন উপরোক্ত কবিতার লাইনগুলোতে।

মানুষের জীবনযাত্রা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ ইত্যাদি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির এ প্রভাব বাঙালি সমাজ জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বর্ষার দিনে বাঙালিদের মানসিক চাহিদা ও অবস্থা তিনি সঠিকভাবে উপলব্দি করে তা কাব্যে রূপ দিয়েছেন। কবি বলেন:

'মনে হয়, আজ যদি পাইতাম কাছে
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।' আকাঙ্ক্ষা। [২৩৭]

কবি বর্ষার মাহেন্দ্রক্ষণে প্রেয়সীর কথা বিশেষভাবে মনে করেন এবং তার সাথে একাকিত্বে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এ কবিতায়। কবি প্রকৃতিকে বালিকার উড়ন্ত কেশের সাথে তুলনা করে বলেন:

'কোথা বা খেলা কর বালিকার মতো,
উড়ে কেশবেশ-
হাসিরাশি উচ্ছ্বাসিত উৎসের মতন,
নাহি লজ্জালেশ।'
প্রকৃতির প্রতি। [২৩৮]

২৩৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ২৮
২৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

সমাজ জীবনে মানুষের পারস্পরিক দুঃখ-কষ্ট, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা ইত্যাদি প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। প্রকৃতির আচরণ সমাজ জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ঋতুভেদে মানুষের জীবন যাত্রায় যে বিশেষ বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সাধিত হয় তারই বর্ণনা দিয়ে তিনি 'ষড়ঋতু' নামক কবিতা রচনা করেন। এক এক ঋতুতে প্রকৃতির এক এক সৌন্দর্য ও সৌরভ পরিলক্ষিত হয়। ফলে মানুষের মন মানসিকতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ইত্যাদির মধ্যেও পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হয়। ষড়ঋতু যেভাবে প্রকৃতিকে সাজায় মানুষের জীবন যাপনের মাঝেও তেমনি বৈচিত্র্য ও শোভা বৃদ্ধি পায়। মানুষের সামাজিক জীবনে বর্ষার মঙ্গল ও কল্যাণের বর্ণনা দিয়ে তিনি রচনা করেন 'বর্ষামঙ্গল' কবিতা। এ কবিতার মাধ্যমে কবির বর্ষা প্রীতি ও বর্ষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে আর্শীবাদ নিয়ে আসে তারই বর্ণনা পাওয়া যায়। কবি বলেন:

'এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা–
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।

-বর্ষামঙ্গল [২৩৯]

বর্ষাকালে সমাজ প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে কবি তাঁর 'ঝড়ের দিনে' কবিতায় বলেন:

আজি এই আকুল আশ্বিনে
মেঘে ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে
হেমন্তস্রধানের ক্ষেতে বাতাস উঠেছে মেতে
কেমন চলিবে পথ চিনে?
দেখিছ না, ওগো সাহসিকা,
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা?
মন ভেবে দেখো তবে এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে
করবীর শেফালি মালিকা।

ঝড়ের দিনে। [২৪০]

২৩৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্পনা, পৃ. ১৩
২৪০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

বর্ষার দিনের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি 'মেঘমুক্ত' কবিতায়। কবি বলেন:

'ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয়–
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায়।
ঝিকিমিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো, ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট।।
পথের দুধারে শাখে শাখে আজি পাখিরা গায়
ভোর থেকে আজ বাদ ছুটেছে, আয় গো আয়।।' মেঘমুক্ত। [২৪১]

বৈশাখ মাসে বাংলার আকাশ দিয়ে কাল বৈশাখী প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। এ ঝড়ে বিগত বছরের সকল জরা-জীর্ণতা, ব্যর্থতা-গ্লানি, দুঃখ-কষ্ট ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় এবং নতুনের শুভ আগমনকে স্বাগত জানায়। এমনি কল্পনাসমৃদ্ধ কবিতা হলো কবির 'বর্ষশেষ' কবিতা। কবি বলেন:

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান–
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান; বর্ষশেষ [২৪২]

কবি অন্যত্র বলেন,

'পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে,
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ–
প্রণমি তোমারে।'

বর্ষশেষ। [২৪৩]

২৪১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, পৃ. ১০১
২৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্পনা, পৃ. ৫৮, ৫৯, ৬১
২৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮, ৫৯, ৬১

বর্ষার পরই আসে শরৎকাল। এ সময় গ্রাম বাঙলার কৃষক পরিবারে আনন্দ উৎসব বয়ে যায়। সোনার ফসলে গ্রাম বাঙলার প্রকৃতির শোভা সকলকে মুগ্ধ করে। কৃষক ফসল কেটে ঘরে তোলে, তারা নতুন ফসল পেয়ে প্রফুল্লচিত্বে নবান্ন উৎসব করে থাকে। এ আনন্দে পল্লী সমাজে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ফসল কাটার পূর্বে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টে যেভাবে মানুষ দিন কাটাতো। ফসল পাওয়ার পর সে পরিবারে দীর্ঘ কষ্টের অবসান হয়। শরৎ ঋতুতে পল্লী সমাজের মানুষগুলোর জীবন ঘনিষ্ট এমন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি তাঁর 'শরৎ' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

'জননী তোমার শুভ আহবান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে–
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।

-শরৎ [২৪৪]

শরতের আগমনকে কবি স্বাগত জানান। কারণ এ শরৎই গরীব অসহায় পল্লী সমাজের মানুষগুলোর দুঃখ-কষ্ট ঘুছাবে। তাদের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দিবে। মাঠ থেকে ফসল কেটে কৃষক নানা বৈচিত্র্যের স্বাদের পিঠা তৈরি করে নবান্ন উৎসব উদযাপন করবে। কবি কৃষকদের মুখে হাসি দেখে নিজেও পুলকিত হন।

এরপরই আসে ঋতুরাজ বসন্ত। বসন্ত আসলে প্রকৃতি নতুন সাজে সজ্জিত হয়। এ পরিবর্তন সমাজে বসবাসরত মানুষদের জীবনকে আন্দোলিত করে। মন-মানসিকতা আনন্দময় হয়ে ওঠে। তাদের আচরণিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কবি 'বসন্ত' নামক কবিতায় ঋতুরাজ বসন্তের সার্বিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে।

কবির ভাষায়:

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,
ওগো মধুমাস,
তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
হইবে প্রকাশ।

২৪৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্পনা, পৃ. ২৮

তোমার কুসুমগুলি, হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ

নিয়ে গেল কোথা!

সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি

স্মিতশুভ্রমুখী

-বসন্ত [২৪৫]

বসন্তের আগমন প্রতীক্ষার কথা কবি এখানে ব্যক্ত করলেন। বসন্ত বাঙালি জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পর্কযুক্ত। বাঙালি সমাজ সংসারের সংযোগ ও বিরাগের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবি তাঁর 'বসন্ত' নামক কবিতার এ লাইনগুলোতে।

২৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্পনা, পৃ. ৬৭

৩য় পরিচ্ছেদ

সমাজ প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় চিন্তা

আহমাদ শাওকী ধর্মীয় বিষয়ক বিভিন্ন সচেতনতামূলক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ও সংচরিত্রের অধিকারী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে, একটি ন্যায়-নীতি ও শান্তির সমাজ বিনির্মাণে রাসূল (স.) এর আর্দশ সকলের অনুকরণ একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন:

و إذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء
و إذا حميت الماء لم يورد و لو أن القياصر و الملوك ظماء
و إذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء
و إذا ملكت النفس قمت ببرها و لو ان ما ملكت يداك الشاء
و إذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الآباء

الهمزية النبوية [২৪৬]

অনুবাদ:

"হে মুহাম্মদ (স.) যখন তুমি বিচার কর তখন মনে হয় নিঃসন্দেহে আকাশ থেকে এ বিচারের রায় হয়েছে।
যখন পানি সংরক্ষণে নিয়োজিত থাক, তখন রাজা-বাদশারা পিপাসার্ত থাকলে ঘাটে নেমে পানি পানের সাহস করে না।
যখন তুমি কাউকে আশ্রয় দাও তখন মনে হয় যে তুমি আল্লাহর ঘর। যেখানে শত্রু আশ্রয় প্রার্থীর নিকট প্রবেশ করতে পারে না।
যখন ব্যাক্তির মালিক হও, তখন তার কল্যাণ করে থাক। যদিও তোমার মালিকানাধীন বস্তুটি একটি বকরিও হয়ে থাকে।
তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে সুসম্পর্কের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ স্বামী এবং পুত্রের নিকট শ্রেষ্ঠ পিতা।"

তিনি আরো বলেন:

إذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء

الهمزية النبوية [২৪৭]

২৪৬। আহমাদ শাওকী, দিওয়ানু আশ শাওকিয়াত (১ম খণ্ড), পৃ. ৪২
২৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

অনুবাদ: "যখন ওয়াদা কর অথবা ওয়াদা দাও তবে তোমার সকল ওয়াদাই পূরণ কর।"

রাসূল (স.) এর প্রশংসায় তিনি বলেন:

ولد الهدى فالكائنات ضياء و فم الزمان تبسم و ثناء

الهمزية النبوية [২৪৮]

অনুবাদ: "হেদায়েতকারী জন্ম গ্রহণ করেছে। তাই সৃষ্টিকূল আলোকিত আর যুগের মুখে মুচকি হাসি ও প্রশংসা।"

মহানবী (স.) এর মিরাজ নিয়ে আহমাদ শাওকী الهمزية النبوية নামক কবিতায় সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন কবির ভাষ্য:

يا أيها المسرى به شرقا إلى مالا تنال الشمس و الجوزاء

يتسائلون و أنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء؟

بهما سموت مطهرين كلاهما نور' و ريحانية' و بهاء

فضل عليك لذي الجلال و منه و الله يفعل ما يرى و يشاء

الهمزية النبوية [২৪৯]

অনুবাদ: "হে রাত্রিকালে ভ্রমণকারী মহান মানুষ! যিনি উচ্চ মর্যাদা নিয়ে (মিরাজের রাত্রিতে) এমন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছেন যেখানে সূর্য ও রাশিচক্রও পৌঁছতে পারেনি।

তারা একে অপরে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ ভ্রমণ কি আধ্যাত্মিক না স্বশরীরী?

আপনি আপনার আলোকময়, সুগন্ধযুক্ত, উজ্জ্বল ও পবিত্রতম আত্মা উভয় সহকারে উর্ধ্বারোহন করেছেন।

এটি ছিল মহা পরাক্রমশালীর পক্ষ থেকে আপনার জন্য বিশেষ অনুগ্রহ ও মর্যাদা। আর মহান আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করে থাকেন।"

এখানে কবি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সামাজিক মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মহান আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। প্রিয় নবীকে একান্ত সাক্ষাতের জন্য মহান আল্লাহ তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে যান। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স.) কে সামাজিকভাবে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেন। মহান

২৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

আল্লাহর সাথে এভাবে সরাসরি সাক্ষাতের সৌভাগ্য ইতোপূর্বে কোন নবী ও রাসূলদের হয়নি। রাসূল (স.) এর ওহী নাজিলের বিষয়টিও আহমাদ শাওকীর কবিতায় স্থান পেয়েছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। তিনি বলেন:

و نودى: اقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قبلت له
هناك أذن للرحمن' فامتلأت أسماع مكة من قدسيه بغم النغم
نهج البردة[২৫০]

অনুবাদ: "আর আহবান করে তাঁকে বলা হলো: আপনি পড়ুন! এর বক্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। এটি ইতোপূর্বে তাকে পড়তে বলা হয়েছিল।

সেখানে করুণাময়ের এমন ঘোষণা ছিল যার পবিত্র আহবানে মক্কা নগরীর কর্ণসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।"

আহমাদ শাওকীর الشوقيات এর ৩য় খণ্ডের অধিকাংশই শোকগাঁথামূলক কবিতা। এসব কবিতায় শাওকী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শোকগাঁথা কবিতা রচনা করেন। তা ছাড়াও তিনি নিকটাত্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নিয়ে শোকগাঁথা রচনা করেন। কবি তাঁর পিতার মৃতদেহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেন:

يا أبي ما أنت فى ذا أول
كل نفس للمنايا فرض عين
هلكت قبلك ناس و قرى
و نعى الناعون خير الثقلين
يرثى أباه [২৫১]

অনুবাদ: "হে পিতা! তুমি প্রথম নও।

প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তোমার পূর্বেও বহু মানুষ ও জনপদ বিলীন হয়েছে

মৃত্যু সংবাদদানকারী মহামানবেরও মৃত্যু সংবাদদান করেছে।"

মুত্যু মানুষের জীবনে পরিসমাপ্তি ঘটায়। এ পরম সত্য কবি উপলব্দি করে বিভিন্ন কবিতা রচনা করেন।

২৫০। প্রাগুক্ত (১ম খণ্ড), পৃ. ২৬৩
২৫১। প্রাগুক্ত (৩য় খণ্ড)., পৃ. ৭৬৩

মৃত্যু বিষয়ে কবির চিন্তা ও চেতনা প্রসূত কবিতাসমূহ হলো:

ليت شعري: هل لنا أن نلتقي

مرة أم ذا افتراق الملوين

و إذا مت و أودعت الثرى

أنلقى حفرة أم حفرتين

يرثي أباءه [২৫২]

অনুবাদ: "হায়! আমাদের কি আবার একসাথ হওয়ার সুযোগ আছে?

নাকি দিবা-রাত্রির বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

আর যখন মৃত্যুবরণ করব এবং আমাকে দাফন করা হবে।

তখন কি একই অথবা দুইটি কবরের গর্তে একসাথ হবো?"

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয় ইঙ্গিত করে কবি বলেন:

قسما بمن يحي العظام

و لا أزيدك من يمين

توت غنخ أمنون [২৫৩]

"শপথ সে সত্ত্বার যিনি অস্থিতে জীবন দান করেন।

এ শপথের ব্যাপারে আমি আপনার সাথে বাড়াবাড়ি করি না।"

মানুষের জন্য পৃথিবী চিরস্থায়ী কোন আবাস নয়। তবে মৃত্যুর পর তার অস্তিত্ব একেবারেই শেষ হয়ে যায় না। বরং সে স্থান ত্যাগ করে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। আখেরাতে তাকে পুনরুত্থান করা হবে এবং তার নতুন জীবন শুরু হবে। শুরু হবে চিরস্থায়ী জীবন। যে জীবনের শুরু আছে তো শেষ নেই। কবি পরকালে তাঁর পিতার সাথে থাকার বাসনা ব্যক্ত করেন উপরোক্ত শোকগাঁথামূলক কবিতায়।

২৫২। প্রাগুক্ত (৩য় খণ্ড), পৃ. ৭৬৪

২৫৩। প্রাগুক্ত (২য় খণ্ড), পৃ. ৪৭২

কবি মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

داء النفوس' و كل داء قبله هم نسين مجيئه بذهابه
النفس حرب الموت' الا أنها أنت الحياة و شغلها من بابه
النفس حرب على طويل بلأئها و تضيق عنه على قصير عذابه

ذكرى كانارفور [২৫৪]

অনুবাদ: "অন্তরের রোগ। রোগে আক্রান্ত হওয়া ও সুস্থ হওয়া পর্যন্ত রোগীর দুচিন্তা হয় এবং কষ্ট পায়।
প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর যুদ্ধে সম্মূখিন হতে হবে। হায়! মৃত্যু যখন তখন জীবনে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা নিয়ে আসে।
দীর্ঘ-জীবন দীর্ঘ দুঃখ-কষ্ট এবং সংকীর্ণ জীবন সংকীর্ণ দুঃখ-কষ্ট।"

খ) সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুসরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি সমাজের মানুষদের মাঝে জাগ্রতকরণে ধর্মীয় চর্চার আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীরভাবে উপলব্দি করেছেন। তবে এক্ষেত্রে নিজ ধর্ম পালনের পাশাপাশি পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব সৃষ্টিরও আহবান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ধর্মপ্রচার' কবিতায়। তিনি ধর্মান্ধতা পরিহার করে সঠিকভাবে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুসরণে সকলকে আহবান জানান। ধর্ম হলো মানবতার শান্তির জন্য। তবে ধর্মকে কেই হাতিয়ার করে সমাজে যাতে করে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয় সকলকে সচেতন থাকাই হলো 'ধর্মপ্রচার' কবিতার উদ্দেশ্য। ধর্মীয় নির্দেশনাবলি সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা সর্বদা বিরাজ করবে, এটাই কবির প্রত্যাশা। 'ধর্মপ্রচার' কবিতায় কবির আহবান হলো:

'ধরণী হইতে যাক ঘৃণাদ্বেষ,
নিঠুরতা দূর হোক।
মুছে দাও, প্রভু, মানবের আঁখি,
ঘুচাও মরণশোক।"
.....
"ধন্য হউক তোমার নাম
দয়াময় যিশুখৃস্ট"
-ধর্মপ্রচার। [২৫৫]

২৫৪। প্রাগুক্ত (১ম খণ্ড), পৃ. ১১৭
২৫৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, পৃ. ৯৬, ৯৭

কবিতার লাইনগুলো রবীন্দ্রনাথের পরধর্মের প্রতি মর্যাদা ও সম্মানবোধের প্রমাণ। নিজের ধর্ম হিন্দু বলে অন্য ধর্ম খৃস্টানদের প্রতি আমাদের হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে, তা হতে পারে না। সকলে স্ব স্ব ধর্ম স্বাভাবিকভাবে পালন করবে এটাই কবির প্রত্যাশা। ধান কাটা নিয়ে কৃষকের আনন্দের শেষ নেই। দিবা-রাত্রী ধান কাটা আর তা ঝক্কি ঝামেলা সামাল দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে আসা। এ যে এক হুলস্থুল কাণ্ড। ধান কাটা শেষ, কেমন করে তা বাড়ীতে নিয়ে আসবে, এমনি এক মূহুর্তে নৌকা ভাড়া করে সব ফসল নৌকায় তোলে আর বিস্তৃত নিঃশ্বাস ফেলে মাঝিকে লক্ষ্য করে বলে-এটা আমার প্রতি তোমার করুণা। কাটা ফসল নৌকা ওঠাতে পেরে কৃষকের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার দৃশ্যটি কবি উপস্থাপন করেছেন এভাবে। কবি বলেন:

"যত চাও তত লও তরণী- পরে।
আর আছে? -আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে।।
এখন আমারে লহো করুণা করে"। সোনার তরী। [২৫৬]

মাঝি কাটা ফসল ওঠানোর পর এখন আর কৃষককে নৌকায় ওঠাচ্ছে না। পুরো নৌকায় ফসলের ঠাঁই হলো; অথচ যে কৃষক কষ্ট করে রোদে পুরে বৃষ্টিতে ভিজে এ ফসল উৎপাদন করল, তারই নাকি নৌকা ঠাঁই হচ্ছে না। কবি কৃষকের আক্ষেপ ও ব্যথাকে কাব্যিক রূপ দিচ্ছেন এভাবে-

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ গগণ ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি-
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।" সোনার তরী। [২৫৭]

২৫৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ০৯
২৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

মানব জীবনের সাফল্য ও সার্থকতা চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এসব খুঁজে পাবার প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে। সতর্কতা ও ধৈর্যের সাথে অবিরাম পরিশ্রম ও সাধনা করে যেতে হবে। এ বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক কবিতা হলো 'পরশ পাথর'। কবি বলেন:

"খ্যাপা [২৫৮] খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেরব।"

-পরশ পাথর। [২৫৯]

পরশ পাথর এমন পাথর যার ছোঁয়ায় সকল কিছু সোনায় রূপান্তরিত হয়। 'পরশ পাথর' কবিতায় 'খ্যাপা' নামক লোকটি পাগলের মতো পরশ পাথরের খুঁজে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। পরশ পাথরের খুঁজে মাথায় চুলে জট বেঁধে গেছে এবং পরিহিত পোশাকে ধুলো-বালিতে ভরপুর হয়ে গেছে। তারপরও সে পেতে চায় সে পরশ পাথর। কবির ভাষায়:

"সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।"

-পরশপাথর। [২৬০]

খ্যাপা জলে ও স্থলে সর্বত্র এ পরশ পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে একসময় এ পরশ পাথর তার কাছে ধরা দিয়েছিল ঠিক। কিন্তু সে অসর্তক ও নির্বোধ হওয়ায় হাতের কাছে পাওয়া সে পরশপাথর তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। কবি বলেন:

"একদা শুধালো তারে গ্রামবাসী ছেলে,
সন্ন্যাসীঠাকুর* এ কী, কাঁকালে ওকি ও দেখি?
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোনার বটে।
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।"

-পরশপাথর। [২৬১]

২৫৮। খ্যাপা অর্থ ভাবুক বা পাগল, ইভান, পৃ. ৪৯
২৫৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃ. ২৯
২৬০। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২৬১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

কবি আরো বলেন:

একি কাণ্ড চমৎকার তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে- এ নহে স্বপন।
কপালে হানিয়া কর বসে পড়ে ভূমি-'পর',
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা।"

পরশপাথর। [২৬২]

খ্যাপার হাতে সোনার শিকল দেখতে পেয়ে গ্রামের ছেলেটি আশ্চর্য হয়ে খ্যাপাকে জিজ্ঞেস করে খ্যাপা, এ সোনার শিকল কোথায় পেলে? খ্যাপা নিজেও অভিভূত হয়। কিন্তু খ্যাপার সোনার শিকল অসর্কতার কারণে হাত ছাড়া হয়ে যায়, তখন সে বুঝতে পারে যে, তার অনুসন্ধিৎসু পরশ পাথর হাতে পেয়েও সে তা হাতছাড়া করেছে। কবি এ কবিতার মাধ্যমে আমাদের সমাজের মানুষগুলোকে কয়েকটি বিষয় সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। আর তা হল:

১। ধৈয্যের সাথে কাজ করা।

২। সচেতন থাকা।

৩। অবিরাম চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাওয়া।

৪। পরিশ্রমী ও অধ্যাবসায়ী হওয়া।

কবির প্রত্যাশা, সমাজের মানুষগুলো সহনশীল ও পরিশ্রমী হলে সুন্দর, উন্নত ও গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একটা সুশীল সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই পরশপাথর। এসব গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ সমাজে থাকলে সে সমাজ হবে সোনালী সমাজ।

আমাদের সমাজ জীবনে অনেকে আছেন যারা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। তারা সমাজ-সংসারে আরাম আয়েশ, সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতার পেছনে ছুটেন। তাদের ধারণা, সমাজ-সংসারের পেছনে দৌড়ানো নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। কবি এসব বৈরাগ্যবাদীদের ধ্বিকার দিয়ে রচনা করেন 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটি। এ কবিতায়

২৬২। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

সমাজ-সংসার বিমুখ চিন্তা ভাবনার অসারতা তুলে ধরে কবি বলেন:

"নিঃশ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি,
কহে ম্রিয়মান মন,
শশী নাই চাই যদি ফিরে পাই
বারবার এ জীবন।"

আকাশের চাঁদ। [২৬৩]

কবি সংসার ত্যাগীদের নিয়ে আপসোস করেছেন। তার মতে, আকাশের চাঁদ পাবো বলে অলিক কল্পনায় সংসারের প্রতি তুচ্ছ মনোভাব পোষণ করা যাবে না। যারা সমাজ-সংসারের মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসাকে ফাঁদ বলে উপেক্ষা করে, তাদের ধিক্কার জানিয়ে কবি বলেন:

"লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা,
তুমি জানিতেছ মনে, সব ছেলেখেলা" মায়াবাদ। [২৬৪]

বৈরাগ্যবাদিরা বিশ্বের মিলনবন্ধনকে ছেলেখেলা বা তামাশা মনে করলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। এ সমাজ-সংসার হলো মানুষের মিল বন্ধনের এক বিশ্ব মেলা। একে উপেক্ষা বা পরিহার করার কোন জোঁ নেই। সমাজ-সংসারে দুঃখ-দুর্দশা, ব্যর্থতা-বেদনা, হাসি-কান্না আসবেই। এসব নিয়েই তো সমাজ। একে কেন্দ্র করেই তো মানুষের আশা-ভরসা, স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা আবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং সমাজে সফলতা আনতে এবং সমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করতে হলে এ সমাজকে ভালোবাসতেই হবে। কবি এ সমাজ সংসারকে মায়ের সাথে তুলনা করে এ সমাজ সংসারকে তিনি কতটা ভালোবাসেন তা স্পষ্ট করলেন তার 'অক্ষমা' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

'যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখ-দুঃখভার
বহুভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।" অক্ষমা। [২৬৫]

২৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
২৬৫। প্রাগুক্ত পৃ. ১০২

সমাজ-সংসারের প্রতি আমাদের মায়া-মমতা বৃদ্ধি করতে হবে। সমাজের মানুষগুলোকে ভালোবাসতে হবে। তাহলেই একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ উপহার দেওয়া সম্ভব হবে। কবি তাঁর কবিতার মাধ্যমে সমাজ সুখীময় হোক এ কামনা করছেন। সমাজ জীবনে নানা দুঃখ, কষ্ট, ব্যর্থতা থাকলেও সমাজ এবং সমাজের মানুষগুলোকে ভালোবেসে কবি এ পৃথিবীকে মমতাময়ী মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। মা যেভাবে তাঁর সন্তানকে আদর, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তোলেন। এ পৃথিবীও বিপুল ভালোবাসা ও মায়া দিয়ে সমাজের মানুষদের বাঁচিয়ে রাখেন। সুতরাং সমাজের মানুষদের কাছ থেকে ভালোবাসা পেতে হলে এ সমাজের মানুষদের প্রাণপণে ভালোবাসতে হবে। কবি এ ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন:

"যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখ-দুঃখভার
বহুভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।"

-অক্ষমা। [২৬৬]

কবির ভাষায়, এ পৃথিবীতে আমরা জন্মলাভ করেছি। সুতরাং এ পৃথিবীতে সুখ-শান্তি, আনন্দ-স্নেহ, মায়া-মমতা পাওয়ার পাশাপাশি দুঃখ-বেদনা, কষ্ট-গ্লানি ও ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার মানসিকতাও রাখতে হবে। দুঃখ-কষ্টের মাঝেই আনন্দ-সুখ খুঁজে নিতে হবে। তবেই সমাজের মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

কবি এ সমাজ প্রকৃতির প্রতি বিমোহিত ও মুগ্ধ। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সুশৃঙ্খলা প্রাণভরে উপভোগ করেছেন। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-গাছালি, সমুদ্রের কলধ্বনি এবং জীব ও জড় জগতের বন্ধন ইত্যাদি তিনি প্রাণভরে উপভোগ করেছেন। জগতের এসব কর্মকাণ্ড কবির নিকট মমতাময়ী মায়ের মতো। জগতের এসব গুণাবলি সমাজের মানুষদের অর্জন করতে হবে। তবে এ সমাজে মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। কবির ধারণা, সমাজের মানুষেরা যদি ভালোবাসা ও মায়া-মমতার বন্ধন সুদৃঢ় করতে পারে তবে এ সমাজের মানুষগুলোর দুঃখ-কষ্ট, বেদনা-গ্লানি ও ব্যর্থতা বলতে

২৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

কিছুই থাকবে না। আর এসব বর্ণনা দিয়েছেন কবি তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। কবি বলেন:

আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো। বিদারিয়া
এ বক্ষ পঞ্চর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীন, আপনার নিরানন্দ

-বসুন্ধরা। [২৬৭]

বসুন্ধরা কবিতায় লাইনগুলোতে কবি পৃথিবীকে মাতৃতুল্য বলে অভিহিত করেছেন। মায়ের স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে এ পৃথিবী যেন কবিকে আপন করে রাখে সে কামনাই করেছেন। সমাজ সংসারের চলার পথে অনেক বাধা-বিপত্তি আসতে পারে। সকল প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে প্রেমিকের প্রতি একান্ত ভালোবাসা নিবেদন করছেন কবি। কবির প্রত্যাশা, এ হালাল বন্ধনের যেন অবসান না হয়। সকল ব্যর্থতা আর হতাশার মাঝেও সমাজকে টিকিয়ে রাখার আহবান জানিয়েছেন কবি 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়। কবি বলেন:

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্যে ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথণ, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দেব' হায়
তুব যেতে দিতে হয়ে. তবু চলে যায়
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।

-যেতে নাহি দিব। [২৬৮]

২৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
২৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

মানুষের সমাজ জীবনের চির সত্য ও শাশ্বত বিষয় হচ্ছে বিদায়। এটি হোক কর্মময় জীবন অথবা চির বিদায়ের মৃত্যু। মানুষ এ পৃথিবীতে স্থায়ী নয়। তাকে কোন না কোন সময় এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতেই হবে। এ চিরসত্যকে উপলব্দি করার জন্য সমাজে বসবাসরত উদাসীন মানুষদের কবি বিশেষভাবে আহবান জানান।

সমাজ জীবনে ধর্মান্ধতা যেমনি ক্ষতিকর তেমনি ধর্মের অপব্যাখ্যা আরও ক্ষতিকর। ধর্ম সমাজকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য এবং সমাজের অন্যায় অপরাধ দূর করে ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য। ধর্মের মাধ্যমেই সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব। অন্যদিকে ধর্মের অপব্যাখ্যা সমাজের স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে, সমাজের মানুষগুলোকে বিপদগামী করে। কবি সমাজের মানুষদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সচেতন করার লক্ষ্যে রচনা করেন 'হিংটিংছিট' নামক একটি ধর্ম বিষয়ক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা।

বাঙালি জীবনে ইউরোপীয় কৃষ্টি কালচারের হাওয়া এসে লাগলে এ উপমহাদেশের একশ্রেণির লোক ধর্মীয় অনুশীলন ও ধর্মচর্চা বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে শুরু করেন। তারা সনাতন হিন্দু ধর্মের নিয়মিত ধর্মীয় কাজ বাদ দিয়ে সকল কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। এমনকি তারা সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি বিভিন্ন অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে থাকেন। এতে ধর্মাবলম্বিদের ধর্ম পালনে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। কবি ধর্মীয় এ বিবাদকে উপজীব্য করে বর্ণনা করেন 'হিংটিংছিট' নামক কবিতাটি।

কবির উদ্দেশ্য, এ কবিতার মাধ্যমে অসচেতন ধর্মান্ধ ব্যক্তিবর্গকে সচেতন করা এবং ধর্মীয় অনুশাসন ও চর্চা অব্যাহত রাখা। কবির ভাষায়:

"এসো ভাই, তোলা হাই, শুয়ে পড়োচিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত
জগতে সকলই মিথ্যা সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়" হিং টিং ছিট। [২৬৯]

২৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

কবি, সমাজ সংসারের ধর্মের বিষয় নিয়ে পারস্পরিক বিবাদ দেখে সকলকে সত্যের পূজারী, সত্যের পক্ষাবলম্বন এবং সত্য অনুসরণের আহবান জানান।

মানুষের সমাজ সংসারের অন্যতম আবশ্যকীয় বিধান হলো মৃত্যু। কবির অধিকাংশ কবিতায় এ বিষয়টি বিশেষ স্থান পেয়েছে। তিনি মানুষের মৃত্যুর কথা স্বরণ করিয়ে রচনা করেন অসংখ্য কবিতা। তন্মধ্যে 'দুঃসময়, মৃত্যুর পরে, ১৪০০ সাল' ইত্যাদি অন্যতম। আপনজন হারানোর ব্যথা কবিকে আন্দোলিত করেছে। মানুষের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী শোকে মুহ্যমান থাকে। এ শোক অতি কষ্টের ও বেদনার। রবীন্দ্রনাথ শোকাহত মানুষদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে রচনা করেন 'দুঃসময়' নামক শোকগাঁথা বিষয়ক কবিতাটি। একজন মানুষের শূন্যতায় সে পরিবারটি কেমন ভাবে ব্যথিত হয় তারই গভীর চিন্তা ও উপলব্দি কাব্যিকরূপ দিয়েছেন কবি এভাবে। কবি বলেন:

'হয়তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর-দূরান্তরে
অজ্ঞাত ভুবন-পরে
কভু কোনো খানে
আর কি গো দেখা হবে,
আর কি সে কথা কবে,
কেউ নাহি জানে'

- মৃত্যুর পরে। [২৭০]

মৃত্যু হলো একজন মানুষের চিরবিদায়। এ বিদায় অনেক কষ্টের ও বেদনার। মৃত্যুর পর পৃথিবীর সাথে তার সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। যা কবিকে দারুনভাবে ব্যথিত করে। সংসারের নিত্য সুখ-দুঃখ ও মায়া-মমতা ত্যাগ করে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের পথ খুঁজছেন কবি। আর তা হলো চির বিদায় বা মৃত্যু। কবির ভাষ্য মতে এ সংসার জীবনের কোলাহল থেমে যাবে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে কবি তা ব্যক্ত করেছেন 'বিদায়' নামক কবিতায়।

২৭০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রা, পৃ. ১২৯

কবির ভাষায়:

'মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়–
শুধু সমাপন।'

-বিদায়। [২৭১]

এখানে কবির আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

বিদায়-বেদনাকে কবি স্তুতি করেছেন 'বিদায়' নামক কবিতার মাধ্যমে:

'হে মহাসুন্দর শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ–
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির
মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।'

-বিদায়। [২৭২]

কবি এ পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখের পাশাপাশি পরকালের কথাও চিন্তা করার করেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। তার মতে, পরপারের ডাক যেকোনো সময় আসতে পারে। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কবি তাঁর 'শেষ হিসাব' কবিতায় বলেন:

'তোমার বিশ্ব উদার রবে
হাজার সুরে তোমায় ডাকে।
আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখতে দেখতে যাবে দেখা–
তুমি একা জগৎ- মাঝে
প্রাণের মাঝে আরেক একা।।

-শেষ হিসাব। [২৭৩]

মানুষ স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। কবি মনে করেন, স্রষ্টাকে পেতে এতো

২৭১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্পনা, পৃ. ৫৭, ৫৮
২৭২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭, ৫৮
২৭৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, পৃ. ৯৭

ঘুরতে হয় না। স্রষ্টাকে পেতে সমাজের বসবাসরত গরীব দুখী, অনাথ অসহায়, গৃহহীন, বস্ত্রহীন মানুষদের ভালোবাসলেই তা পাওয়া যায়। অভুক্তকে অন্ন দিলে, পিপাসার্তকে তৃষ্ণা মিটালে, গৃহহীনকে গৃহ তৈরি করে দিলে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিলে, অসুস্থ ও রুগ্নকে সেবা করলে মহান স্রষ্টার সন্ধান মিলে। তাই কবি ধনবানদেরকে সমাজের এসব অসহায় লোকদের পাশে থাকার আহবান জানিয়েছেন তাঁর 'দেবতার বিদায়' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

'সে কহিল, 'চলিলাম'- চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মুতি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, 'প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে।'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্র রূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীন গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।' দেবতার বিদায়। [২৭৪]

বাঙালির ঘরে ঘরে মেয়েদের সন্ধ্যায় কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায়। সেসময় অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো অতিথি আসলে চরম উৎকণ্ঠা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ঘরে অভ্যর্থনা বা সাদরে গ্রহণ করতে হয়। তারই একটি চমৎকার উপলব্দি প্রকাশ পেয়েছে কবির ' অতিথি' নামক কবিতায়। কবি বলেন:

'ঐ শোনো গো অতিথি বুঝি আজ
এল আজ।
ওগো বধূ রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ।
শুনছ নাকি তোমার গৃহদ্বারে
ঠিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা-সাঁজ।' অতিথি। [২৭৫]

২৭৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী (৩য় খণ্ড), পৃ. ২২
২৭৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

এ জগত সংসারে আমরা যতই ব্যস্ততায় থাকিনা কেন? যতই আনন্দ ফূর্তিতে কাটাইনা কেন? জীবন সংসারের সন্ধ্যা একদিন নেমে আসবেই। এ সময়ে অতিথি রূপে হঠাৎ মৃত্যুর দূতের আগমন ঘটে। এ আগমনে আমরা হয়তো অপ্রস্তুত হয়ে যাই, কিন্তু বাস্তবতাকে কিন্তু উপেক্ষা করা যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ঘরে সাদরে গ্রহণ করতে হয়। কবি এর মধ্য দিয়ে মানুষের মৃত্যুর কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আরবি ও বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় সাহিত্যিক শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়কে অত্র গবেষণা কর্মে সামাজিক কবি হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের কবিতায় সমাজ চিন্তার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তারা সমাজ নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। সমাজের প্রতিটি বিষয় নিয়ে এতোটা চিন্তা পূর্বের কোন কবি-সাহিত্যিক করেননি। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তারা কবিতার মাধ্যমে দিয়েছেন। সমাজের মানুষদের সচেতন করতে তাদের কবিতা অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। সমাজের সকল অসংগতি ও অপসংস্কৃতি চর্চা অপসারণে তাদের কবিতা প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। তারা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে কবিতা রচনা করেন। তারা নারীর স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা ও বাল্যবিবাহ নিয়ে কথা বলেছেন। নারীকে সামাজিকভাবে মর্যাদা দানে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা নিজেদের যৌতুক ও মাদক বিরোধি আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছেন। স্ব স্ব ধর্মীয় অনুশাসন পালনের আহবান জানিয়ে তারা নিজেদের অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করেছেন। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের রচিত বিভিন্ন কবিতায়। তারা উভয় ছিল কাজ প্রেমিক। তাদের মতে পরিশ্রমই সমাজ উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই তারা দেশবাসীকে পরিশ্রমী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। তাদের বিভিন্ন কবিতায় দেশ ও জাতির উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। কবিতায় তাদের গ্রামীন ও শহুরের সমাজ চিত্র সকলকে বিমোহিত করেছেন। পাস্পরিক ভালোবাসা যে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তা তারা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষকে সামাজিকীকরণে স্বভাব-চরিত্রে প্রকৃতির প্রভাব ব্যাপক। তারা এতসব সংস্কারের পরেও মানুষের মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী এবং তা যে কোন মূহুর্তে আসতে পারে সে বিষয়ে মানুষকে সচেতন করেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেছেন। পরস্পরের প্রতি প্রেম-ভালবাসার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেছেন। নারী অধিকার, বহুবিবাহ, সামাজিক অনাচার ইত্যাদি নিয়ে জোরালো ভাবে কলম ধরেছেন। এসব গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শাওকী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে সামাজিক চিন্তা ও চেতনায় নিজ নিজ অঙ্গনে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের সমাজ বিষয়ক এ

সকল চিন্তা-ভাবনা এ গবেষণাকর্মে তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সকল আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে পাঠক, গবেষক ও চিন্তাশীল লেখক বেশ উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। পবিত্র কুরআনুল কারিম

২। ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.), মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০১০ খ্রি.

৩। ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র.), আবূ দাউদ শরীফ ৫ম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৬ খ্রি.

৪। আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরবি, মিসর: দারুল মা'আরিফা, ২০০০ খ্রি.

৫। হান্না আল ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরবী, লেবানন: আল মাক্তাবাতুল বুলসিয়া, ১৯৮৭ খ্রি.

৬। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০২

৭। প্রশান্তকুমার পাল, রবি জীবন, প্রখম খণ্ড, কলকাতা: ভুর্জপত্র, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ

৮। আবু ইসহাক ইভান, রবীন্দ্রনাথ: কবি ও কাব্য, ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১৫

৯। ড. শাওকী দাঈফ, আল আদব আল আরবি আল মু'য়াসির ফি মিসর, কায়রো: দারুল মায়া'রিফ, মিশর, ১৯৬১

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, কলকাতা: অশোক বুক এজেন্সী, ২০০২

১১। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২

১২। আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আশশা'আরি আল- আরবি আল-হাদিস, বৈরুত: দারুল জাইল, ১৯৭১

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, ঢাকা: জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, মে ২০১৩

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্পনা, ঢাকা: শব্দশিল্প, ২০১৯ খ্রি.

১৫। ইসমত মাহদী, Modern Arabic Literature, রাব্বি পাবলিশার্স, হায়দ্ররাবাদ, ১৯৮৩ খ্রি.

১৬। ড. রহমান হাবিব, রবীন্দ্রকাব্যদর্শন, ঢাকা: সূচিপত্র, ২০০৬

১৭। আহমাদ শাওকী, দিয়ানু আশ শাওকিয়াত ১ম খণ্ড-৪র্থ খণ্ড, মিসর: মুয়াস্সাতু হিনদাবি লিল তা'লিম ওয়াছ ছাকাফাত, ২০১২ খ্রি.

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, জুন ১৯৯৫

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ড, ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

২১। বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ, আহমদ রফিক, ঢাকা: কাকলি প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.

২২। আহমাদ শাওকী, আস সিত্তু হুদ মিসর: মুয়াস্সাতু হিনদাবি লিল তা'লিম ওয়াছ ছাকাফাত, ২০১২ খ্রি.

২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স ২০১৬

২৪। অধ্যাপক ড. ফজলুল রহমান, আরব মনীষা, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, জুন ২০০৩

২৫। ড. আহমদ আলী, আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, চট্টগ্রাম: আল-আকিব প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৪ খ্রি.

২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.

২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাব্যগীতি, কলিকাতা: বিশ্বভারতী ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলা , ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৮

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৬

৩০। শামসুজ্জামান, সেলিনা হোসেন, আজহারুল ইসলামসহ প্রমূখ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫